দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়

মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস

মনসামঙ্গল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সর্বাধিক প্রচারিত, দীর্ঘ কয়েক শত বছর ধরে পরিব্যাপ্ত, সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং মঙ্গলকাব্যধারায় সর্বপ্রাচীন কাব্য। মনসামঙ্গল বাংলার লোকসমাজের কাব্য, নিজস্ব কাব্য। বাংলাদেশের দীর্ঘকালের সমাজ জীবন ও লোকসমাজের নির্যাস গ্রহণ করে এই কাব্যধারা পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। মনসামঙ্গলের কবিগণ কেউই কিন্তু নাগরিক সমাজের বিদগ্ধ কবি ছিলেন না; জনসভার কবি ছিলেন। কেউ কেউ হয়ত রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন, কিন্তু তাদের মনোরঞ্জনার্থে কাব্যরচনা করেননি। কবিগণ অনেকেই ছিলেন গায়েন মাত্র; তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা যে খুব বেশী ছিল তা নয়। বিজয় গুপ্ত তো মনসামঙ্গলের প্রাচীনতম কবি কানা হরি দত্তকে মূর্খ বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তা দেবী মনসার উক্তি বলে গণ্য হয়েছে। জনসভার কবি হওয়াতে তাঁদের জনসংযোগ ছিল অত্যন্ত সম্পৃক্ত; তাঁরা আপন সমাজ-চরিত্রানুযায়ী সমাজধর্ম ও লোকধর্মকে নিরীক্ষা করেছিলেন। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে লোকউৎসবকে কেন্দ্র করে সমগ্র পল্লীবাসী এক সামিয়ানার নীচে সমবেত হত - তারা প্রত্যেকে লোকমানুষ। সেখানে পরিবেশিত হত মঙ্গলগান, সেখানে গায়ক ও শ্রোতা সকলেই সম স্তরের মানুষ। সর্পভীতিজাত সর্পদেবী মনসার পূজাবিধি লোকায়ত এবং অঞ্চল বিশেষে পৃথক পৃথক রীতি প্রচলিত ছিল; পালাগান গাওয়ারও পৃথক পৃথক রীতি প্রচলিত ছিল।

মনসাপূজার প্রচলনঃ সর্পদেবী মনসার কৌলীন্য নাম মাত্র; সে পৌরাণিক দেবী নয়, লৌকিক দেবী, ব্রতের দেবী। হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে তার আবরণটুকু ধরা যায় মাত্র। বৈদিক-আর্য প্রভাবের বাইরে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বিশেষত দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় প্রভাবিত সমাজে এই দেবীর সৃষ্টি। সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশে সর্পভীতি থেকে সর্পদেবী মনসার সৃষ্টি হয়েছিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সর্পদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। পুরুষতান্ত্রিক বৈদিক আর্য সমাজে স্ত্রী দেবতার প্রভাব ছিল না। বাংলাদেশে সর্পপূজা ও দেবী মনসার উৎস সন্ধান করতে গিয়ে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ সুকুমার সেন বিস্তৃত আলোচনা করেছেন; তা থেকে আমরা মনসার পৌরাণিক ও লৌকিক উৎস সম্পর্কে জানতে পারি। দেবী মনসার উৎস সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতামত উদ্ধৃত করা হল— ডঃ সুকুমার সেনের মতে, আদি দেব নিরঞ্জনের মানসোদ্ভূতা সর্পদেবী মনসা, পর্বতবাসিনী কুমারী বিষবিদ্যার দেবী এবং সিজবৃক্ষ পূজক সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ফলে মঙ্গলকাব্যের দেবী মনসার উৎপত্তি। বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্রের জাগুলী বা জাঙ্গুলী দেবীও মনসার সঙ্গে এক হয়ে গেছে।[১] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যও ডঃ সেনের মত বৌদ্ধ মহাযানতন্ত্রের দেবী জাগুলী তারাকেই মনসা দেবীর ভিত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও তিনি দাক্ষিণাত্যের সর্পদেবী 'মুদামা'র প্রভাবের কথা স্বীকার করেছেন।[২] তিনি একথাও বলেছেন পরবর্তীকালে জৈন ঐতিহ্যের পদ্মাবতী এবং মহাভারতে উল্লিখিত জরুৎকারু প্রসঙ্গও মনসার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গেছে।[৩]

মনসামঙ্গলের কবি ও কাব্যঃ মনসামঙ্গল যেহেতু সর্বাধিক প্রচারিত কাব্য, তাই বৃহত্তর অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব ধারা অনুসারে, নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে গড়ে উঠেছে। মনসামঙ্গলকে বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিভাজন অনুসারে তিনটি ধারায় ভাগ করা যায়। এই তিনটি ধারা হল–

(১) পূর্ববঙ্গীয় ধারা, (২) দক্ষিণবঙ্গীয় ধারা এবং (৩) উত্তরবঙ্গীয় ধারা। এই তিন ধারার প্রধান কবিগণ হলেন ঃ

১। পূর্ববঙ্গীয় ধারায় – বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস ও জীবন মৈত্র।

২। দক্ষিণবঙ্গীয় ধারায় - বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বিষ্ণু পাল।

৩। উত্তরবঙ্গীয় ধারায় – তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল।

এছাড়াও কয়েকজন অপ্রধান কবি আছেন, যেমন ষষ্ঠীবর দত্ত, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, দ্বিজ রসিক, বাণেশ্বর রায় প্রমুখ।

মনসামঙ্গলের কাহিনী অংশ অত্যন্ত সুপরিচিত বলে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, তবে বিভিন্ন কবির রচিত মনসামঙ্গলের কাহিনী একই এবং অঞ্চল বিশেষে সামান্য কিছু পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। পৃচ্ছানুগ্রাহিতার কারণে কবিগণ বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনার সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছেন মাত্র। তিন বঙ্গের কাহিনীতে এবং বিভিন্ন কবির সময়কালের ভিত্তিতে যে সামান্য পরিবর্তন তাতে সমাজ ইতিহাসই চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ইতিহাসকে উদ্‌ঘাটিত করাই আমার উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে কাব্যের আঙ্গিক নির্মাণে, ভাষা সংস্থাপনে, বর্ণনা ভঙ্গীতে কবিগণের আপন প্রতিভা, আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও সমসাময়িক কালের সত্যকে গ্রহণ করতে হয়েছে। সুতরাং তিন বঙ্গের মনসামঙ্গলের একেকটি ধারাকে অবলম্বন করে সেই বঙ্গের সমাজ চিত্রগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব, যা সমাজ ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মূল্যবান। একাধিক কবির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করব, এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রধান কবিদের কাব্য অবলম্বনে আমার আলোচনা এগিয়ে চলবে। অবশ্য অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিরক্ষেত্রেও এই রীতি প্রযোজ্য হবে।

মনসামঙ্গল কাব্য ধারার প্রাচীনতম কবি হলেন হরি দত্ত। হরি দত্ত সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না বলেই পণ্ডিতদের অভিমত। সম্ভবত বিজয় গুপ্তের পূর্ববর্তী কবি বলেই বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্যে হরি দত্তের প্রসঙ্গ এনেছেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন হরি দত্তের সময়কাল সম্পর্কে লিখেছেন — " বিজয়গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুসেন শাহের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার সময়ে যে গীতি বহুকাল প্রচলিত থাকিয়া লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অন্ততঃ দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হওয়ার সম্ভাবনা। সুতরাং কাণা হরিদত্ত মুসলমান কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, আমরা এরূপ অনুমান করিতে পারি।"[৪] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য হরি দত্তকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ববর্তীকালে স্থাপন করেছেন।[৫] বিজয় গুপ্ত পদ্মাপুরাণে হরি দত্তকে মূর্খ বলে উল্লেখ করেছেন; তিনি জানিয়েছেন হরি দত্তের গীত কালে কালে লুপ্ত হয়ে গেছে এবং কাব্যটি ত্রুটিপূর্ণ তাই মনসার পছন্দ হয়নি। কানা হরি দত্তের কাব্য পাওয়া যায়নি তবে প্রাচীনতম কবি হিসাবে তাঁকে প্রথমে রাখা প্রয়োজন।

পূর্ববঙ্গীয় ধারা ঃ পূর্ববঙ্গীয় মনসামঙ্গল কাব্য-ধারার অন্যতম কবি হলেন বিজয় গুপ্ত এবং নারায়ণ দেব। বিজয় গুপ্ত বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা সনাতন এবং মাতা রুক্মিণী দেবী। বিজয় গুপ্তের কাব্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের মধ্যে প্রথম সন-তারিখ যুক্ত কাব্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টচার্য বিজয় গুপ্তকে 'ঋতু শশী বেদ শশী' পাঠ ধরে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপন করতে চেয়েছেন। বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন সেই হিসাবে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ যুক্তিযুক্ত। ডঃ ভট্টাচার্যের ভাষায় - "শেষোক্ত পদটি হইতে ১৪১৬ শকাব্দ বা ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যাইতেছে। এই সময় হুসেন শাহ গৌড়ের সুলতান ছিলেন। অতএব এই সময়টিই বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।"[৬] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতই ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দকে বিজয় গুপ্তের সময়কাল ধরেছেন, তবে তিনি মনে করেন, এ সমস্ত কল্পনা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়— "বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া প্রথম পয়ারের সনটি (১৪১৬ শক বা ১৪৯৪ খ্রীঃ অঃ) কাব্যরচনার সন বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। অবশ্য এ সমস্ত সন-তারিখের জল্পনা যে খুব নির্ভরযোগ্য নহে, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ নানা পুঁথিতে যে পয়ার তিনটি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে ঐক্য নাই।"[৭]

বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যটি স্থূলায়তন এবং পালাভিত্তিক রচনা। 'বন্দনা' অংশ দিয়ে কাব্যের সূত্রপাত। এর পর কাব্যদেহ এভাবে সাজানো - স্বপ্নাধ্যায় পালা, মনসার জন্ম পালা, চণ্ডীর সহিত শিবের সাক্ষাৎ ও বিবাদ

পালা, মনসাকে চণ্ডীর দর্শন ও প্রহার, পদ্মার বিবাহ, বিচ্ছেদপালা, সমুদ্রমন্থন, পদ্মার বনবাস, রাখয়াল বাড়ীর পূজা, কাজির সহিত যুদ্ধ, গুয়াবাড়ী কাটা পালা, মহাজ্ঞান হরণ, সঙ্কুর গাড়রি নিধন, ছয় কুমার বধ, ঝাল বাড়ী পূজা, অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ ও যম যুদ্ধ, চাঁদসদাগরের দক্ষিণ পাটন গমন, বস্তু বদল পালা, ডিঙ্গা বুড়ান, চান্দের অবস্থা ও লক্ষ্মীন্দ্রের জন্ম, লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহের জোড়ানি, লোহার বাসর গঠন, লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহ, লক্ষ্মীন্দ্র দংশন, ভাসান, জিয়ান, ইত্যাদি। বন্দনা ও স্বপ্নাধ্যায় সহ মোট ছাব্বিশটি পালায় কাব্যটি রচিত।

পূর্ববঙ্গীয় ধারার অপর প্রখ্যাত কবি হলেন নারায়ণ দেব। নারায়ণ দেব বর্তমান পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত মৈয়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার বোরগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।কবির পিতার নাম নরসিংহ দেব, মাতা রুক্মিণীদেবী। কবির উপাধি ছিল 'সুকবিবল্লভ'। নারায়ণ দেবের কাব্য শ্রীহট্ট বা সিলেট এবং আসাম অঞ্চলে বিশেষ প্রচারিত হওয়ায় তাঁকে শ্রীহট্ট ও আসামের মানুষ হিসাবে দাবী করা হয়। অন্যান্য কবিগণের মত নারায়ণ দেবের সময়কাল নির্ণয় নানা জটিলতায় আকীর্ণ। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন নারায়ণ দেব সম্ভবত বিজয় গুপ্তের সময় কালেই কাব্য রচনা করেন।[৮] ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য নারায়ণ দেবের বংশতালিকা বিচার করে তাঁকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্থাপন করেছেন। ডঃ ভট্টাচর্যের ভাষায় –"চারি পুরুষে এক শতাব্দী ধরিয়া লইলে নারায়ণ দেব আনুমানিক সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।"[৯] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নারায়ণ দেবকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ বা কিছু পরে স্থাপন করেছেন।[১০] ডঃ সুকুমার সেন এ সম্পর্কে বলেছেন —"ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত ধরিলে ভ্রান্তির সম্ভবনা কম হয়।"[১১]

নারায়ণ দেবের কাব্যও স্থূলায়তন। তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' গ্রন্থের আঙ্গিক নির্মাণে খানিকটা বৈচিত্র্য দেখা যাচ্ছে। 'বন্দনা' দিয়ে কাব্য শুরু এবং তারপর ভবানীর বিলাপ, চণ্ডীর ডুমনীবেশ ধারণ, নেতার জন্ম এবং পদ্মার জন্ম পালা; তারপরই হঠাৎ শুরু হয়েছে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ ও মনসাদেবীর প্রতাপ, বিবাহ উপলক্ষে বেহুলার সাজসজ্জা ও বিবাহ অনুষ্ঠান, বেহুলার বিবাহে তাড়কার রন্ধন, নারীগণের হাস্যপরিহাস ও বাসিবিবাহ, চাঁদসদাগরের স্বদেশে প্রত্যাগমন, লোহার বাসর ও মনসাদেবীর কোপ, লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগিনীর দংশন, বেহুলার বিলাপ, সনকার রোদন, চাঁদসদাগরের ক্রোধ, ভেলা নির্ম্মাণ, বেহুলার বিদায় গ্রহণ, লক্ষীন্দরের মৃতদেহ সহ বেহুলার ভেলা ভাসান, প্রথম বাঁকে মনসাদেবীর পরীক্ষা, বিভিন্ন বাঁকে বেহুলার বিপদ ও বাঁকের বিবরণ, নেতার সহিত বেহুলার সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহ-লাভ, শিবের নিকট বেহুলার অনুগ্রহ-লাভে নেতার প্রচেষ্টা, শিবের আদেশে দেবসভায় বেহুলার নৃত্য, দেবসভায় বাদানুবাদ ইত্যাদি। এরপর আকস্মিক ভাবে শুরু হয়েছে লক্ষ্মীন্দরের জন্ম বিবরণ। মনে হয় মনসা যেন দেবসভায় বিবরণ দিয়েছে কিভাবে সে দেবলোক থেকে নরলোকে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরকে নিয়ে এল এবং চাঁদসদাগরের সর্বনাশ করল। এখানে পরপর পালাগুলি হল, বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের জন্ম-বিবরণ ও মনসাদেবীর যমরাজার সহিত যুদ্ধ, ঊষা ও অনিরুদ্ধকে মর্ত্যলোকে আনয়ন, চন্দ্রধরের বাণিজ্য-যাত্রা, চন্দ্রধরের দক্ষিণপাটন আগমন, চন্দ্রধরের বদল-বাণিজ্য, চন্দ্রধরের পাটন হইতে স্বদেশ যাত্রা, মনসাদেবী কর্তৃক চন্দ্রধরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবান, ডিঙ্গা ডুবির ফলে চন্দ্রধরের দুর্দ্দশা, চন্দ্রধরের স্বগৃহে আগমন, ভাটের বর্ণনা শ্রবণে লখাইর বিবাহ অভিলাষে চন্দ্রধরের উজানি নগর যাত্রা, বেহুলাকে পদ্মাদেবীর ছলনা, বেহুলার লোহার তণ্ডুল রন্ধন, চন্দ্রধরের সহিত সাহেরাজার যুদ্ধ, সাহেরাজা ও চন্দ্রধরের মিত্রতা, কেসাই কামারের উপর মনসাদেবীর ক্রোধ বর্ণিত হবার পর 'পূর্বকথা' সমাপ্ত, তারপর আবার ফিরে এসেছে লখাইর পুনর্জ্জীবন লাভের বিবরণ, চৌদ্দ ডিঙ্গাসহ বেহুলা-লখাইর যাত্রা, চন্দ্রধর কর্তৃক পদ্মা-পূজার উদ্যোগ, চন্দ্রধরের পদ্মা-পূজা, বেহুলার পরীক্ষা, বেহুলা-লখাইর উজানি নগরে গমন, বেহুলা-লখাইর স্বর্গারোহণ ইত্যাদি। তমোনাশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ নির্ভরযোগ্য সংস্করণ নয় বলে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, কারণ এতে পুঁথির

পাঠ উল্টাপাল্টা হয়ে গেছে। তাঁর মতে- "১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ তমোনাশচন্দ্র দাশগুপ্তের সম্পাদনায় নারায়ণদেবের যে পদ্মাপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আদৌ নির্ভরযোগ্য নহে। তাহাতে বিভিন্ন পুঁথির পাঠ উল্টাপাল্টা হইয়া গিয়াছে।"[১২]

পূর্ববঙ্গীয় মনসামঙ্গলের অপর একজন কবি হলেন দ্বিজ বংশীদাস। ইনি চৈতন্য পরবর্তীকালের অন্যতম কবি। কবির নাম বংশীদাস চক্রবর্তী। বংশীদাস মৈমনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাতুয়ারী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতা যাদবানন্দ, মাতা অঞ্জনা দেবী। ইনি প্রথম বাঙালী মহিলা কবি দেবী চন্দ্রাবতীর পিতা। নারায়ণ দেব ও দ্বিজ বংশীদাস একই স্থানের মানুষ ছিলেন। কবি প্রদত্ত কাল নির্দেশক পয়ার অনুযায়ী বংশীদাস ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু এই পয়ারটির প্রামাণিকতা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁকে সপ্তদশ শতাব্দীতে স্থাপন করতেই আগ্রহী। তাঁর মতে— "পারিপার্শ্বিক সমস্ত ঘটনা বিবেচনা করিয়া দ্বিজ বংশীকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করাই সমীচীন বোধ হয়। দ্বিজ বংশীর ভাষা ও স্থানীয় জনশ্রুতি এই সময়ের অনুকূল।"[১৩] সম্ভবত বংশীদাস ও নারায়ণ দেব পরস্পরের প্রতিবেশী হওয়ার জন্য এবং উভয়ের জনপ্রিয়তা ব্যাপক হওয়ায় বংশীদাসের কাব্যে নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত রচনা প্রবেশ করেছে। বংশীদাসের কাব্যে প্রতিটি প্রসঙ্গ পৃথক পৃথক শিরোনাম অঙ্কিত। পূর্ববঙ্গীয় মনসামঙ্গলের অপর দুই অপ্রধান কবি হলেন ষষ্ঠীবর দত্ত এবং জীবন মৈত্র। ষষ্ঠীবর শ্রীহট্টের এবং জীবন মৈত্র বগুড়ার কবি ছিলেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে ষষ্ঠীবর নারায়ণ দেব অপেক্ষা শতাধিক বৎসরের পরবর্তী কবি।[১৪] আর জীবন মৈত্র ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কাব্য রচনা করেন।[১৫]

দক্ষিণবঙ্গীয় ধারাঃ মনসামঙ্গলের দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার অন্যতম দুজন কবি হলেন বিপ্রদাস পিপিলাই এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। অন্যান্য অপ্রধান কবিদের মধ্যে রয়েছেন বিষ্ণু পাল, সীতারাম দাস, বাণেশ্বর রায় প্রমুখ। বিপ্রদাস পিপিলাই মনসামঙ্গলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ডঃ সুকুমার সেন বিপ্রদাস সম্পর্কে বলেছেন – "বিপ্রদাস মনসা-পাঞ্চালীর সবচেয়ে পুরানো কবি। তাহার রচনা অখণ্ডিত ও অছিন্ন রূপে পাওয়া গিয়াছে। মনসার সম্পূর্ণ কাহিনী একমাত্র বিপ্রদাসের কাব্যেই লভ্য।"[১৬] ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্রদাসের প্রাচীনতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কাব্যে কবি প্রদত্ত পয়ার 'সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ' এবং হুসেন শাহের নাম উল্লিখিত হলেও কিছু আধুনিক স্থানের নাম, আধুনিক বাংলা ভাষা প্রয়োগের ফলে তাঁকে ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রাচীন বলতে চান না ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত পণ্ডিতরাও।[১৭] বিপ্রদাস কাব্যে কামানের ব্যবহার উল্লেখ করেছেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর প্রথম পানিপথের যুদ্ধে প্রথম কামান ব্যবহার করেন। সুতরাং কাব্যটি ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী রচনা হওয়া সম্ভব। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন— "বড়ই বিস্ময়ের বিষয় বিপ্রদাসের পুঁথিতে সেরূপ কোন প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই— যদিও চারিখানি পুঁথির মধ্যে তিনখানির অনুলিপির কাল বিজয়গুপ্তের ১৮৩৭ সালের পুঁথির অপেক্ষা প্রাচীনতর।"[১৮] বিপ্রদাসের কাব্যে আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পয়ার আছে -

"মুকুন্দ-পণ্ডিত সুত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি নাদুড়্যা বটগ্রাম॥
বাৎস্য গোত্র পিপলায় পঞ্চ প্রবর।
সাম বেদ কুতুব শাখা চারি সহোদর॥
শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥" (বিপ্রদাস/৩)

চব্বিশপরগণা জেলার নাদুড়্যা-বটগ্রামে বিপ্রদাস জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ নাদুড়্যা বটগ্রামকে আধুনিক বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া বলে মনে করেন। কবির পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। বিপ্রদাসের কাব্যের নাম 'মনসাবিজয়'।

মনসাবিজয় পালাভিত্তিক রচনা, এখানে আছে মোট তেরোটি পালা। পালাগুলিতে কাব্য বিষয়গুলি নিম্নরূপে গ্রথিত

প্রথম পালা – দেববন্দনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মের নির্দেশে পদ্মফুল তুলতে শিবের কালিদহে গমন, পার্বতীর ডোমনী বেশ ধারণ, মনসার জন্ম, পার্বতী মনসার কলহ, মনসার বনবাস।

দ্বিতীয় পালা – সিজুয়াতে নগর স্থাপন, মনসার সজ্জা, কপিলার মাহাত্ম্য, দেবতাদের সমুদ্রমন্থন।

তৃতীয় পালা – শিবের মন্থনজাত বিষ ভক্ষণ, মনসা কর্তৃক শিবের পুনর্জীবন, মনসার বিবাহ।

চতুর্থ পালা – জনমেজয়ের সর্পসত্র যজ্ঞ বর্ণনা, চাঁদ সদাগরের পরিচয়, চণ্ডী কর্তৃক কুবুদ্ধি প্রদান, রাখালগণের মনসাপূজা, হাসন-হোসেন পালার একাংশ।

পঞ্চম পালা – হাসন-হোসেন পালার শেষ অংশ, হাসন কর্তৃক মনসাপূজা, জালু-মালুর মনসা পূজা, সনকার মনসাপূজা, মনসার ঘটবারি ভাঙা, চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ, সাধের বাগান ধ্বংস।

ষষ্ঠপালা – ধন্বন্তরি বধ।

সপ্তম পালা – ধনা-মনা বা ধন্বন্তরির সাঙ্গাৎ বধ।

অষ্টম পালা – চাঁদ সদাগরের প্রত্যক্ষ বিবাদ, ছয় পুত্র বধ, অনিরুদ্ধ ঊষা হরণ; চাঁদের বাণিজ্যযাত্রার উদ্যোগ।

নবম পালা – বাণিজ্যযাত্রা, বস্তুবদল।

দশম পালা – বেহুলা লখীন্দরের জন্ম, চাঁদের প্রত্যাবর্তন, সপ্তডিঙ্গা ডোবান।

একাদশ পালা - চাঁদের স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন, লখীন্দরের বিবাহের আয়োজন।

দ্বাদশ পালা – লখীন্দরের বিবাহ, বাসরঘর নির্মাণ, সর্পদংশন, বেহুলার দেবলোক যাত্রা, নৃত্য পরিবেশন।

ত্রয়োদশ পালা – লখীন্দরের পুনর্জীবন থেকে স্বর্গারোহণ পর্যন্ত।

দক্ষিণবঙ্গীয় মনসামঙ্গলের অপর কবি হলেন কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ। কবির নাম ক্ষেমানন্দ, সম্ভবত প্রকৃত নাম শঙ্কর মণ্ডল। আত্মবিবরণী অংশে কবি লিখেছেন —

"শুনহ মণ্ডল তুমি : উপদেশ কহি আমি : গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে।
প্রসাদ তাহার পাত্র : ইঙ্গিত পাইল মাত্র : পলাইল শঙ্কর মণ্ডল।
প্রসাদ হরিষ হয়্যা : যুক্তি দিন আশ্বাসিয়া : ধান্য কিছু দিলেন সম্বল॥" (ক্ষেমানন্দ/৫-৬)

ক্ষেমানন্দ মনসাকে 'কেতকা দেবী' বলে উল্লেখ করেছেন এবং কেয়াপাতায় জন্মপ্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। তাই কবি 'কেতকাদাস' এই উপনাম গ্রহণ করেছেন। ক্ষেমানন্দ যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তাতে কোন সুস্পষ্ট কবি-পরিচয় নেই, তবে কবি সম্পর্কে কতকগুলি তথ্য পাওয়া যায়। কবির আত্মবিবরণীটি উদ্ধৃত করা গেল –

"শুন ভাই পূর্ব্বকথা : দেবী হৈলা বরদাতা : সহায়পূর্ব্বক বিষহরী।
বলিভদ্র মহাশয় : চন্দ্রহাস সম হয় : তাহার তালুকে ঘর করি॥
– – – – – – –
শূন্য রস বাণ শশি : সিয়রে মনসা আসি : আদেশিলা রচিতে মঙ্গল।
দেবী মনসার গীত : ক্ষেমানন্দ বিরচিত : নায়কের করিবে কুশল॥"(ঐ/৫-৬-৭)

ক্ষেমানন্দ দামোদর তীরবর্তী কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবি কাব্যে ভারমল্ল. বিষ্ণুদাস. বারা খাঁ প্রমুখ ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ করেছেন। বারা খাঁ দক্ষিণ রাঢ়ে সেলিমাবাদের শাসনকর্তা ছিলেন। কবির বিবরণ অনুসারে বারা খাঁ যুদ্ধে নিহত হন এবং তার পরবর্তীকালে কবি কাব্য রচনা করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন -"১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দে বারা খাঁ প্রদত্ত একটি দানপত্র পাওয়া গিয়াছে এই সময়ের পর তিনি যুদ্ধে নিহত হন এবং তাহার পর কেতকাদাসের মনসা-মঙ্গল রচিত হয়।"[১১] মোটামুটি ভাবে বলা যায় ক্ষেমানন্দ সপ্তদশ

শতাব্দীর মধ্যভাগে কাব্য রচনা করেন। তিনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর পরবর্তীকালীন কবি, কেননা কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রভাব স্পষ্ট। মুকুন্দের অনুকরণেই তিনি কাব্যে বিস্তৃত আত্মবিবরণ দিয়েছেন এবং প্রতিটি পদের পৃথক পৃথক নামকরণ করেছেন। স্মরণীয় মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলই সর্বপ্রথম মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করেছিল। দক্ষিণবঙ্গীয় ধারার অন্যান্য কবিগণের মধ্যে প্রধান হলেন বিষ্ণু পাল, ইনি বীরভূমের কবি। কবি জাতিতে কুম্ভকার, রাণীগঞ্জের নিকটে সেরগড় পরগণার কোন এক গ্রামে কবি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বীরভূম অঞ্চলে বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গল ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার সঙ্গে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনার মিল দেখে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন- ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি যখন রাঢ় অঞ্চলে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তখন অর্থাৎ সপ্তদশ- অষ্টাদশ শতাব্দীতে কবি মনসামঙ্গল কাব্যখানি রচনা করেছিলেন।[২০] তাঁর কাব্যে চণ্ডীমঙ্গলের মত আটটি পালা আছে। বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গল 'অষ্টমঙ্গলা গান' নামেও পরিচিত।

উত্তরবঙ্গীয় ধারাঃ মনসামঙ্গলের উত্তরবঙ্গীয় ধারার অন্যতম কবি হলেন জগজ্জীবন ঘোষাল এবং তন্ত্র বিভূতি। জগজ্জীবন ঘোষাল কাব্যের বিভিন্ন জায়গায় ভণিতা অংশে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় কবি রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কবির পিতা রূপ রায়চৌধুরী, পিতামহ জয়ানন্দ চৌধুরী, মাতা রেবতী দেবী, কবির বর্ণনানুসারে —

"চৌধুরী রূপরায় সর্ব্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন॥" (জগজ্জীবন/ ২১০)

কবির নিবাস দিনাজপুর জেলার কুচিয়ামোড়া গ্রামে; তিনি কাব্যে দিনাজপুরের মহারাজা প্রাণনাথের নাম উল্লেখ করেছেন। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গলের সম্পাদক আশুতোষ দাস মহাশয় কাব্যে মহারাজা প্রাণনাথের নাম উল্লেখ থেকে মনে করেন জগজ্জীবন সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পর কাব্য রচনা করেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য – প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হয়েছিলেন এই তথ্য ধরে জানিয়েছেন – "মনে হয়, জগজ্জীবনের কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই রচিত হয়।"[২১] ডঃ সুকুমার সেনও মনে করেন অষ্টাদশ শতাব্দী আরম্ভের আগেই জগজ্জীবনের কাব্য রচিত হয়।[২২] জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল একটি স্থূলায়তন কাব্য; কাব্যে দু'টি অংশ দেবখণ্ড ও বাণিয়া খণ্ড। দেবখণ্ডটি আকারে ছোট এবং বাণিয়া খণ্ডটি আকারে বড়। দেবখণ্ডে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা থেকে মনসার সঙ্গে শিবের সাক্ষাৎ, গৃহে আনয়ন ও চণ্ডীর সঙ্গে কলহ পর্যন্ত; আর বানিয়া খণ্ডে চাঁদ সদাগরের পিতা কোটীশ্বর সদাগরের কাহিনী থেকে। উত্তরবঙ্গীয় ধারার অপর কবি হলেন তন্ত্রবিভূতি। কবির নাম সম্ভবত বিভূতি এবং কবি তান্ত্রিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে তাঁর নামের পূর্বে 'তন্ত্র' এই উপনামের ব্যবহার আছে। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং কাব্যে 'দ্বিজ', 'দ্বিজসুত' ইত্যাদি কথা ব্যবহার করেছেন। আবার ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন— কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন তন্তুবায় বা তাঁতি, সেকারণে তিনি 'তন্ত্র' এই উপনাম গ্রহণ করেছেন।[২৩] তিনি আরও মনে করেন তন্ত্র বিভূতির কাব্যের অনেকটাই জগজ্জীবনের রচনা, তাই 'দ্বিজ' ও 'দ্বিজসুত' বলতে জগজ্জীবনকেই বোঝানো হচ্ছে।[২৪] তাঁর 'মনসাপুরাণ' কাব্যে 'তন্ত্রবিভূতি', 'বিভূতি' এবং জগজ্জীবন ঘোষালের ভণিতাও আছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— "১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তাঁহার কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।"[২৫] তন্ত্রবিভূতির কাব্যেরও দুটি অংশ দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ড।

তিন বঙ্গের মনসামঙ্গলের ত্রিধারায় কবিদের কাব্য আঙ্গিকে ও কাহিনী গ্রন্থনে কিছু কিছু পার্থক্য আছে; কাহিনী

সম্পর্কিত সংযোজন বিয়োজন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তথ্যেও পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং দ্বিজ বংশীদাসের মধ্যে বিজয় গুপ্ত ও বংশীদাসের কাব্যে হাসন- হোসেন পালা বর্ণিত হয়েছে, আবার বিপ্রদাস পিপিলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও বিষ্ণু পাল তিন জনের কাব্যেই হাসন-হোসেন পালা আছে। উত্তরবঙ্গীয় কবিদের কাব্যে হাসন-হোসেন পালা নেই। শুধু তাই নয়, বর্ণনার বিষয়েও পার্থক্য আছে। কোথাও নেতার জন্ম শিবের ঘাম থেকে আবার কোথাও শিবের জটার জল থেকে। বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবের কাব্যে অনিরুদ্ধ-উষা হরণ, যমযুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগর ও সাহেরাজার যুদ্ধ প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে, অন্য কাব্যগুলিতে তা নেই। বংশীদাস ও জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ সদাগরের জন্মবিবরণ আছে, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, বিপ্রদাস, তন্ত্রবিভূতির কাব্যে এই প্রসঙ্গটি নেই। প্রত্যেক কবির কাব্যেই প্রচুর পৌরাণিক প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয়েছে, তবে চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি বংশীদাস, ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবনের কাব্যে পৌরাণিক প্রসঙ্গের বর্ণনা বেশী মনে হয়। চৈতন্য পরবর্তীকালের কাব্য বলেই অনেক বেশী পৌরাণিক ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে, আর জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দরের মাতুলানীর শ্লীলতাহানি প্রসঙ্গ বর্ণনা আছে। যাই হোক বিভিন্নক্ষেত্রে যে তফাৎগুলি লক্ষ করা যাচ্ছে তা কালের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ ইতিহাসের বিষয় রূপে বিবেচিত হতে পারে।

সমাজবৃত্ত ঃ মানুষই ইতিহাসের অন্যতম উপাদান, আর নানা বস্তুকে আশ্রয় করেই মানুষ ভাবময় জগতে প্রবেশ করে থাকে। প্রাচীনযুগ থেকেই তাই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের মূল্য অপরিসীম। যখন ইতিহাস রচনার রেওয়াজ ছিল না, তখন ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুসমূহের মধ্যে ইতিহাসকে অন্বেষণ করতে হয়েছে। ইতিহাস শুধুমাত্র শাসকের রক্তচক্ষু নয়, জনসমাজও সেখানে যুক্ত হয় তার বৈশিষ্ট্য নিয়ে। জনসমাজে আবিষ্কৃত মানুষের ব্যবহৃত বস্তুকে নিয়েই গড়ে ওঠে সমাজ ইতিহাস। মুখে শুনে কিংবা দেখে শিখে সমাজ ইতিহাসের উপাদানগুলি পুরুষানুক্রমে প্রবাহিত হয় এবং বিভিন্ন জনসমাজে বিস্তারলাভ করে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ সমস্ত উপাদানগুলি বিভিন্ন হয়ে থাকে। আর্য-অনার্য, ব্রাহ্মণ ও লৌকিক নিম্নবর্ণের সমাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদানগুলি সামান্য বিভিন্ন। আবার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল কাব্যে ব্যবহৃত উপাদানগুলি অনেকক্ষেত্রে অভিন্ন, কারণ একই বাঙালী সমাজের আশ্রয়েই তা বিকাশলাভ করেছে, তবে পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ স্থানভেদে সামান্য বিভিন্ন। সমাজ ইতিহাসের এ সকল উপাদানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা—

১। বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ খাদ্য-পানীয়, গৃহাস্থালীর দ্রব্য, সাজ-সরঞ্জাম, পোশাক-পরিচ্ছদ, যানবাহন, শিল্পবস্তু, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।

২। বিশ্বাস ও সংস্কার-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান, রীতিনীতি-প্রথা ইত্যাদি।

৩। ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ শিক্ষা-সংস্কৃতি।

৪। ক্রীড়া-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ স্বাস্থ্য-শরীরচর্চা ও বিনোদন।

৫। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ ছড়া, পাঁচালী, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধাঁ।

বস্তু-কেন্দ্রিক উপাদানঃ

খাদ্য ও পানীয় ঃ মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বাঙালী জীবনের সর্বরূপের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন. বাঙালী সমাজের বিভিন্ন লৌকিক উপাদানগুলির ব্যবহারে তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথমে আসা যাক্ খাদ্য ও পানীয় ঘটিত উপাদানের কথায়। বাঙালী ভোজন রসিক। প্রাকৃতপৈঙ্গল ও চর্যাপদে রসনাপ্রিয় বাঙালীর পরিচয় পাওয়া যায়. মঙ্গলকাব্যগুলিতে এই পরিচয় আরও স্পষ্ট। রন্ধনকার্যে বাঙালী নারীর মত পুরুষরাও সিদ্ধহস্ত ছিল, মঙ্গলকাব্যের রন্ধন বর্ণনা থেকে তা জানা যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিগণ হেঁসেলের খবর রাখতেন। মনসামঙ্গলে রন্ধনকার্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাঙালীর প্রধান খাদ্য ভাত ও মাছ; 'মাছে ভাতে বাঙালী' এই প্রবাদটি মঙ্গলকাব্যগুলিতে

সত্যে পরিণত হয়েছে। বাঙালীর প্রধান খাদ্য দুই প্রকার – আমিষ ও নিরমিষ। আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার মাছ, যথা— ইলিশ, রুই, কাতলা, মাগুর, কই, চিতল, সোল, পাবা, বাইন, বোয়াল, পুঁটি, মৌরলা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার মাংস, যথা— খাসির মাংস, হরিণের মাংস বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। নিরামিষ ব্যঞ্জনের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মুগ, মসুর মাষকলাই, খেসারি, ছোলা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার শাক্সবজি, যথা— কচু, ওল, পুঁই, নিম, শিম, বেগুন, কাঁচাকলা, মূলা, হিঞ্চে, পালং, নালতে, গীমে ইত্যাদি। মিষ্টান্ন জাতীয় খাদ্যে বাঙালী গৃহিণীরা শুধুমাত্র রসনা পরিতৃপ্তই করত না, শৈল্পিক দক্ষতা প্রদর্শন করত। বিভিন্ন প্রকার মিষ্টান্ন বাঙালীর অতি প্রিয় খাদ্য। দুধ, গুড়, চিনি, নারকেল, চালগুঁড়ো সহযোগে বিভিন্ন প্রকার লোভনীয় খাদ্য পিঠা, পায়েস, ক্ষীরপুলি, দুগ্ধপুলি, দুগ্ধচুষি, নারিকেলপুলি, মুগসাউলি, সরুচাক্লি, রুটি, চিতুইপুলি, কলাবড়া, তালবড়া, ছানাবড়া, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরসা, চন্দ্রকান্তি ইত্যাদি তৈরী করত। দুগ্ধজাত খাদ্য হিসাবে দধি, দুগ্ধ, দৈ, ঘোল বা তক্র, ঘি ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। শুকনো খাবার হিসাবে চিড়া, মুড়ি, মুড়কি, গুড়, সন্দেশ, নাড়ু, মোয়া অতি জনপ্রিয় খাবার। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে সনকার সাধভক্ষণ উপলক্ষে বিস্তৃত রন্ধন তালিকা পাই —

"তেতইলের কাষ্ঠে অগ্নি করে ধুক্ ধুক্।
নারিকেল খাড় দুগ্ধে রান্ধে মুগ সুপ॥
শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে তাল বাইয়ন পোড়া॥
রান্ধন রান্ধিতে সোনাইর দ্বারে বাজে শিঙ্গা।
নারিকেল দিয়া রান্ধিলেক ঝিঙ্গা॥
লতা পাতা সর্ব্ব শাক করে ফেচ ফেচা।
নারিকেল ঘৃত দিল আর আদা ছেচা॥
বাইগন সলুফা অতি দেখিতে শোভন।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সুকত পাচন॥
রন্ধন রান্ধিয়া সোনাই ভরে বাটী বাটী।
ঢেকির কড়ি দিয়া রান্ধে কাঁঠাল আটি॥
খেসারির ডাইল রান্ধে কাঁটালের মুছি।
দুগ্ধ লাউ দিয়া রান্ধে খাড়লা মুছি॥
রন্ধন রান্ধিয়া সোনাই করিল ভাগ ভাগ।
হিঙ্গ মরিচে রান্ধিলেক শ্বেত সরিষার শাগ॥ (বিজয় / ২৯৮-২৯৯)

বাঙালীর ঘরে আমিষ এবং নিরামিষ পৃথক পৃথক ভাবে রান্না হত, এমন কি পৃথক হেঁসেলও থাকত। যেমন—

"নিরামিষ রান্ধিয়া করিল একভিত্য।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিতে গেল চিত্ত॥
বড় বড় সওল মৎস্য রাঙ্গা হইছে কোল।
কত তৈলেত ভাজে কত রান্ধে ঝোল॥
ছোট ছোট চেঙ্গ মৎস্যের ফালাইয়া মুড়।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক নন্দন বারিব থোড়॥
বড় বড় ইচা মৎস্যের ফেলাইয়া তালু।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সঙ্কচুর আলু॥

বড় বড় চাইন মৎস্য দেখিতে বড় ভাল।
কত করে ভাজা ভোজা কত করে ঝোল॥
বড় (বড়) কই মৎস্য করিয়া ভাগ ভাগে।
তাহা রান্ধিল লাউ আলু কচু লগে॥
চেঙ্গ পোড়া দিয়া রান্ধে মিঠা আমের বউল।
কলার মূল দিয়া রান্ধে পীপলিয়া সউল॥
রান্ধিতে রান্ধিতে সোনার কানের লড়ে সোনা।
কটু তৈল দিয়া ভাজে রাঙ্গা সৈলের পনা॥
ছোট ছোট নালি মৎস্যের ফালাইয়া মুড়ি।
সরূসা বাটিয়া দিয়া রান্ধিলেক ঝুরি॥
... ...
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিয়া করে এক ভিত।
মাংসের ব্যঞ্জন রান্ধে হৈয়া হরসিত॥
ধূম নিধূম রান্ধে দিয়া চৈইর ঝাল।
আখিনি পলাহু রান্ধে ঘৃতের মিশাল॥
খির খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ মিঠা।
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা॥ (ঐ/২৯৯-৩০০)

বিজয় গুপ্তের কাব্যে দক্ষিণ পাটনে গিয়ে চাঁদ সদাগর খেচরান্নের সুখ্যাতি করে, খিচুড়ি বা খেচরান্ন একটি অতি প্রিয় বাঙালী খাবার —

"অধিক তৃপ্তি হয় খাইয়া নিরামিষ।
ঘৃত দিয়া খায় যদি রান্ধিয়া খিচরি।" (ঐ / ২৭১)

এছাড়াও কচ্ছপের মাংস, পাঁঠা ও খাসীর মাংস, কবুতরের মাংস, হরিণের মাংস, হাঁসের ডিম খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলে বেহুলার বিবাহে তাড়কার রন্ধন বর্ণনায় পাই—

"খাসির মাংস তোলে ঘৃতেতে ছাবিয়া।
হরিণের মাংস কথ অম্বল রান্ধিয়া॥
মেসের মাংস কত সুর্দ্ধ চাইয়া লইল।
তলিত মরিচ দুই বেঞ্জন রান্ধিল॥
জত্ন করিয়া পাছে রান্ধে কবুতর।
তলিত মরিচ দুই হয় সমসর॥
কাচুয়া কৎসবের আসুলি পাসুলি।
সব রস রাখিয়া রান্ধে ঘৃতে তুলি॥"(নারায়ণ / ৪৮)

বিপ্রদাসের কাব্যে সনকার সাধভক্ষণের রন্ধন কৌতুকাবহ —

"দুগ্ধ গুড় নারিকেল শর্করা নবাত
বিবিধ পিষ্টক সজ্জা করে নানামত।
উত্তম তণ্ডুল-গুড়ি দুগ্ধ চিনি দিয়া
দুগ্ধ-ফেনি সজ্জ কৈল প্রচুর করিয়া।

আসিকা ভিজায় দুগ্ধে রাখিল প্রচুর
খিরপুলি দুগ্ধ-চুষি রাখিল প্রচুর।
নারিকেল-পুলি মুগ-সামলি বিস্তর
রুটী সরুচাকলি করিল বহুতর।
রান্ধিল শাকের ঘন্ট ডালি আর মৎস্য
কতেক প্রকার ভাজা করিল অসচ্য।
লাউর অম্বল রান্ধে তাহে গুড় দিয়া
পরমান্ন রান্ধে বধূ হরষিত হইয়া।
দুগ্ধে চিড়া দিয়া কাটি দিল বহুতর
অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল দিলেক তারপর।
পশ্চাতে শর্করা দিয়া ওলায়্যা রাখিল
আর বধূ হড়ি ঘৃত চড়াইল।
সুপক্ক হইল ঘৃত দেখিয়া সত্বর
পরমান্ন দিল নিয়া তাহার উপর।
লবঙ্গ মরিচ জীরা আর জায়ফল
এলাইচ দালচিনি গুড়াইয়া সকল।
আগে নারিকেল কোড়া দিলেক তাহাতে
সকল মসলা লইয়া দিলেক পশ্চাতে।
ঘন ঘন কাটি দিয়া ঢালিলো পাত্রেতে
শাল্যা তুণ্ডলের অন্ন রান্ধে হরষিতে।" (বিপ্রদাস / ১৫০)

বংশীলসের কাব্যে শুলুকার রন্ধনের বিস্তৃত বিবরণ আছে, তা অতি মনোহর—

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন স্তরে, বসাইল একেবারে,
সম্বরিল তৈল ঘৃত ঢালি॥
প্রথম নালিতা শাকে, রান্ধিলেক ঘৃত পাকে,
কচু শাকে নারিকেল কাটি।
সাঞ্চিশাক ঘৃতে ভাজে, আদা দিয়া তার মাঝে,
লাঠাশাকে জিরা লঙ্গ বাটি॥
পালঙ্গ শাক বসাইয়া, তার মধ্যে জ্বাল দিয়া,
পাশরিয়া না দিল লবণ।
নাড়িতে সে জল ফোটে, খর জ্বালে ধুঁয়া উঠে,
লাজে শুনাই বিরস বদন॥
ঘৃতে ভাজে নিমপাতে, উদিসা পূরল তাতে,
বেথ অগ্রে থৈরের চসি।
বার্ত্তাকু তরাই ঝিঙ্গা, ভাজে দুগ্ধরাজটাঙ্গা,
কাঁচাকলা ভাজে দুগ্ধ কসি॥
কদু কুমড়ার চাকি, হরিদ্রা পিঠালি মাখি,

বসবাস জিরা লঙ্গ বাটি॥

কচু আনাজ কাঁঠাল হালি, রান্ধিলেক ঘৃতে তুলি,

ছিম উরূসিব কর্কটি॥

একে একে নিরামিষ, রান্ধিলেক ব্যঞ্জন ত্রিশ,

সুক্তা মরিচ মুগডালি।

অম্ল রান্ধে পাকাকলা, আদা লেবু পৈরাম্বলা,

দ্বিজ বংশীদাসের ছিকলি॥" (বংশীদাস / ১০৬)

দ্বিজ বংশীদাসের পদ্মাপুরাণে আমিষ রান্নার একটি নাতিদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। যেমন– চাঁদের ভোজনে শুলুকার রন্ধন অংশে আছে —

"নিরামিষ ব্যঞ্জন সব ঘৃতে সম্বরিয়া।
মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধে তৈল পাক দিয়া॥
বড় বড় কৈ মৎস্য ঘন করি আঞ্জি।
বসবাস মাখিয়া তৈলেতে কৈল ভাজি॥
কাতলের পেটি ভাজে মাগুরের চাকি।
চিতলের পেটি ভাজে জিরা লঙ্গ মাখি॥
ইলিসা তলিত করে বাচা ভাঙ্গেনা।
শোলের খাড়কি ভাজে সউলের পনা॥
বড় বড় ইচা ভাজে ধনিয়া তলিত।
মূলা কাটি থুইলেক তাহার সহিত॥
বেতডোগা পলি রান্ধে চোচূড়া মৎস্য দিয়া।
সুখেতে ব্যঞ্জন রান্ধে আদা তাহে দিয়া॥" (ঐ / ১০৬)

বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে তত্ত্ব হিসাবে শুকনো খাবার পাঠানো হয়েছিল—

"চিপট মুড়কি দিল মলাম সন্দেশ।
রসাল পানের বিড়া ভোগাদি বিশেষ॥
ডাগর ঝালের নাড়ু চিনি চাঁপাকলা।" (ক্ষেমানন্দ / ২৬৩)

বাঙালীর রান্নায় বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহারের কথা পাওয়া যায়। তাছাড়া চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা অংশে নানা প্রকার মসলার কথা আছে, যেমন — ডালের বড়ি, আদা, নারকেল, সুক্তা, কাঁচা হলুদ, জিরা, লবঙ্গ, এলাজ, জয়িত্রী, জায়ফল, দারুচিনি, সরিষা, মরিচ, পিপলি, জোয়ানি, কালজিরা, তেজপাতা, হিং, কর্পূর, গুড়ঞ্চক ইত্যাদি। রান্নায় সাধারণত সরিষার তেল, ঘি, তিসি ও তিল তেল ব্যবহার করা হত। তাছাড়া শুঁটকি মাছের ব্যবহার ছিল; পেঁয়াজ ও রসুনের ব্যবহার হিন্দুসমাজে প্রায় ছিল না, নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যবদল অংশে পেঁয়াজ ও রসুনের কথা পাই –

"রসুণ পেয়াজ ধরি সতগুণে জউ ভরি
কর্পূর বদলে বাখর।" (নারায়ণ / ১৮১)

বিভিন্ন রকম ফল, মিষ্টিআলু, আম, কাঁঠাল, আমলকি, হরিতকি, চালতা, ডেঁফল, ডাউয়া, বহেরা, কমলালেবু, করঞ্জা খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত —

"খাইতে মউয়া আলু মিটা সোণা তার গোটা গোটা

নারেঙ্গ কমলা আর জত।

... ...

ঘৃত রসা আমলকি পহেলা বয়েড়া হরিতকী

আলু আর করঞ্জা বহেড়া।" (ঐ)

রন্ধন বাঙালীর কাছে অতি পবিত্র কার্য, তাই স্নান করে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান করে ঘি, ধূপ, দীপ দিয়ে অগ্নিপূজা করে রন্ধনে নিযুক্ত হত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে সনকার রন্ধনকালে এমনি পারিপাট্যের চিত্র পাই –

"স্নান করিয়া সোনই চড়াইল রন্ধন।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন॥
নানা দ্রব্য উপহার কিছু দুঃখ নাই।
রন্ধনের দ্রব্য যত থুইল ঠাই ঠাই।
আগে পূজিল অগ্নি ধূপ দীপ দিয়া।
চড়াইল রন্ধন রাণী হরষিত হইয়া॥" (বিজয় / ২৯৮)

বাঙালীর হেঁসেলে আমিষ, নিরামিষ, পিঠা ও মিষ্টান্ন পৃথক পৃথক ভাবে রান্না হত। পরিবেশনেও বাঙালীয়ানার নিজস্ব কৌম বৈশিষ্ট্য ছিল। ভোজনের স্থান মার্জনা করে পিঁড়ি পেতে ভোজন করাই রীতি এবং প্রথমে শাক-সুক্ত ও নিরামিষ ব্যঞ্জন, পরে আমিষ ব্যঞ্জন এবং শেষে টক ও মিষ্টান্ন দ্রব্য পরিবেশন করা হত। বিপ্রদাসের বর্ণনা অনুযায়ী —

"পরে ভোজনের স্থানে করিল মার্জনে।
বিচিত্র কাঞ্চন পিঁড়ি তাহাতে রচিয়া
সনকা বসায় অতি সাদর করিয়া।
সুবর্ণের থালে অন্ন করিয়া চরণ
প্রথমে দিলেক শাক হরষিত-মন।
ক্রমে ক্রমে দিল সুখে জতেক বেঞ্জন
হরিষে সনকা রামা করএ ভোজন।
কতেক প্রকার দিল পিষ্টক আনিয়া
দুগ্ধ-গুড় দিল রামা প্রচুর করিয়া।
বাটি ভরি পরমান্ন দিলেক হরিষে
অমৃতসমান দ্রব্য অশেষ বিশেষ।" (বিপ্রদাস / ১৫০)

ধনী বাঙালী গৃহে ত্রিশ, পঞ্চাশ, ছাপান্ন, চৌষট্টি ব্যঞ্জন রান্নার কথা মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। নিম্নশ্রেণীর মানুষ ও দরিদ্রদের খাদ্য ছিল সাধারণ—পান্তা-আমানি, গাঁদাল পাতা, বিভিন্ন প্রকার মাছ ও পশুপাখির মাংস, নানা প্রকার শাকসবজি ইত্যাদি। আহার শেষে তার অঙ্গ হিসাবে পান-সুপারির বহুল প্রচলন ছিল। তাছাড়া অতিথি আপ্যায়নে, নিমন্ত্রণে পান-সুপারি ব্যবহার বিশিষ্ট রীতি। যেমন বিপ্রদাসের কাব্যে পাই—

"কর্পূর-তাম্বুল সুখে পূরিয়া বদনে
যাত্রার উদ্‌যোগ ডাক পড়ে ঘনে ঘনে।" (ঐ/১৮২)

সাধারণ মানুষ প্রচুর পান-সুপারি খেত, তাই মঙ্গলকাব্যে পান-সুপারির প্রচুর ব্যবহার দেখি। যেমন—

"হাল বাহে শিব কৌতুক বড় রঙ্গে।
বৃষহ জুড়িল হর খায় পান রঙ্গে॥" (জগজ্জীবন / ২২)

বংশীদাসের কাব্যে পাই এই প্রসঙ্গ –

"ভোজন করিয়া খায় কর্পূর তাম্বুল।" (বংশীদাস/১০৭)

পান-সুপারি দ্বারা অতিথি আপ্যায়ন ও নিমন্ত্রণ বাঙালী সমাজে একটি বিশিষ্ট রীতি; মনসার বিবাহকালে দরিদ্র শিবের সংসারে পান, সুপারি, তেল, সিন্দুরের অপ্রতুলতার কথা বলা হয়েছে—

"আইয় আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
তৈল সিন্দুর পাইব কথায়ে।" (বিজয় / ৭৪)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাওয়া যায় কাজলাকে চাঁদ পান-সুপারি দিয়ে আপ্যায়িত করেছে –

"কাজলারে ডাক্যা সাধু তারে দিল পান।
কাজলা মাল্যানী করে মউর নির্ম্মাণ।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৭)

তাছাড়া পান-সুপারিকে অনেক সময় সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক হিসাবে দেখা হত। চুয়া, কর্পূর, সুপারি, নানা রকম মসলা সহযোগে পান সাজানোর কথাও মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়।

গৃহস্থালীর দ্রব্য ঃ লোকজীবনের অঙ্গ নানা রকম গৃহস্থালীর উপাদান, সাজসরঞ্জাম, কৃষিজ উৎপাদন যন্ত্র, অস্ত্রশস্ত্র , বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির ব্যবহার মনসামঙ্গল কাব্যে আছে। গৃহাস্থলীর দ্রব্য হিসাবে হাঁড়ি, কলসী, থালা, বাটি, ঘটি, চাড়ি, পাতিল, সরা, প্রদীপ, ডাবর, ঝারি, খুরি, বাটা, চালুনি, পিকদানী, করণ্ডি বা সাজি, ডালা, ধুচুনি, কুলা, চুপড়ি, কাঠা, খুচি, উনান, কাটারি, ব্যজনী বা পাখা, পিঁড়ি, দড়ি, সেচনি, পাটা, ছাতা, ইত্যাদির ব্যবহার দেখা যায়। নারায়ণ দেবের কাব্যে দেখি লখীন্দরের বিবাহে তাকে থালায় খেতে দেওয়া হয়েছে –

"একে একে বর্জিত কৈলা লক্ষিন্দর
ভাল অন্য আনিঞা থালের উপর॥" (নারায়ণ / ৫১)

বিপ্রদাসের কাব্যেও থালার ব্যবহার দেখি, যেমন–"হস্ত পাখালিল বধূ থালের উপর।"(বিপ্রদাস/১২৯)

কুম্ভ বা কলসী জলপাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। বাঙালী বধূরা কাঁখে করে জল আনত –

"পুনরপি পদ্মাবতী বধূ-রূপ হইয়া
কাঁখে কুম্ভ করি বলে চাঁদো কাছে গিয়া।" (বিপ্রদাস/১৫৯)

ঝারিও জলপাত্র হিসেবে ব্যবহৃত হত, যেমন—

"চলিল সুরনারী লইয়া হেম-ঝারি
জল সহে ঘরে ঘরে।" (ঐ/৪১)

ফুল তোলার জন্য করণ্ডি বা সাজি ব্যবহার করা হত। আমরা জানি শিবঠাকুর মনসাকে ফুলের করণ্ডিতে করে লুকিয়ে এনেছিল, পার্বতী করণ্ডি থেকে মনসাকে আবিষ্কার করে –

"এহার তরে কপাট বান্ধিয়া গেলা আজি।
সকল ফুল তুলিয়া ভাঙ্গিব ফুলের সাজি॥" (বিজয় / ৪৬)

ঘট একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, জলপাত্র হিসাবে ব্যবহার ছাড়াও পূজা-পার্বণে ঘট ব্যবহার করা হত। বিপ্রদাসের কাব্যে পদ্মাপূজায় ঘটের ব্যবহার আছে। যেমন—

"সুবর্ণের ঘটে দিবা সিজের পল্লব।" (বিপ্রদাস/৮৮)

হাঁড়ি বা পাতিল একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। রন্ধনকার্যে হাঁড়ির ব্যবহার করা হয়। পূর্ববঙ্গের ভাষায় তাকে 'পাতিল' বা 'পাতালি' বলে. বংশীদাস তার উল্লেখ করেছেন –

"এক মুখে দিল জ্বাল, নয় মুখে শোভে ভাল,
বসাইল নয়টি পাতালি।" (বংশীদাস/১০৬)

পিঁড়ি বসার আসন এবং গাড়ু আঁচানোর জলপাত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত। ভোজনকালে সমস্ত পরিপাটি করে সাজিয়ে দেওয়া হত, যেমন –"থাল গাড়ু পিঁড়ি দিল ভোজনের তরে।" (ঐ/১০৭)

চালুনি একটি প্রয়োজনীয় উপকরণ, মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও এর প্রয়োজন হয় —

"সুবর্ণের চালুনবাতি মেনকা লৈঞা রঙ্গে
জামাতা বরিতে যায় রাইহোগণ সঙ্গে॥" (জগজ্জীবন / ১৯৩)

তাছাড়াও জাঁতি, সাঁড়াশি, বাটি ইত্যাদির কথা পাওয়া যায়, যেমন –"কাঞ্চন বাটিতে কর কাঁচা দুগ্ধ পান।"(ক্ষেমানন্দ/ ২৫৬), কিংবা, "সর্পের গলায় দিল সুবর্ণ সাঁড়াশি।" (ঐ), কিংবা, 'তিয়ড়ি' বা উনুনে রান্না করা হত, যেমন— "তিন নারিকেল দিয়া সাজাল্য তিয়ড়ি।" (ঐ)। তাছাড়া তরাজু, ডালা, কোদাল, ছাতা, ভাঁড়, দড়ি ইত্যাদির কথা আছে। যেমন ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে রাখাল বালকদের মনসাপূজা উপলক্ষে নানা দ্রব্যের কথা পাই –

"ছেলি ভাঁড় ছাতা বাড়ি : শিরেতে লইয়া কড়ি : উপনীত বুড়ীর নিকটে।
যতেক রাখাল ভাই : কোদালে চাঁছিয়া ঠাঞি : পূজা করে কচুয়ার তটে॥
... .
মোদক দোকানে বালা : ধরিয়া তরাজু ডালা : কিনিল সন্দেশ মিঠাখণ্ড।
ঝুরি নিল তিন পুয়া: আদেসা সন্দেশ মুয়া : আদসের নিল নব খণ্ড॥" (ঐ/৯৬)

কৃষিকাজের উপযুক্ত সাজসরঞ্জামের ব্যবহারও আছে মনসামঙ্গলে। সেকালের কৃষিকার্যে ব্যবহৃত উপকরণগুলির মধ্যে দিয়ে চাষবাসের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। চাষের কাজে লাঙল, জোঁয়াল, পাচনি, টোকা, কাঠি, কাটারি, বাকুরি বা বাঁক ইত্যাদি ব্যবহৃত হত। বিপ্রদাসের কাব্যে হাসন-হোসেন কৃষিকার্যে নিযুক্ত; কৃষাণ দিয়ে তারা চাষাবাদ করে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে —

"শতেক কৃষাণ সদা আছে নিয়োজিত
চষিতে গমন কৈল বড় হরষিত।
জোয়ালি জুড়িয়া গরু লইল খেদাইয়া
হরিষে চলিল হাথে পাচনি লইয়া।
বুহিতা বাকুড়ি গিয়া দিল দরশন
লাঙ্গল জুড়িয়া চাষ চষে সর্বজন।" (বিপ্রদাস / ৬৩)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে শিবঠাকুরের হাল বওয়া ও চাষবাসের কথা আছে, যেমন –

"সোনার লাঙ্গলে হাল জুড়ে পশুপতি।" (জগজ্জীবন/২২)

অন্যান্য বৃত্তির সঙ্গে যুক্ত সরঞ্জাম, যেমন— তাঁতির তাঁত, কুমারের চাক, ছুতোরের ক্ষুর-বাটালি, জেলের জাল-বঁড়শি, তাছাড়া দা, কাটারি, বটি ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় উপকরণ। জগজ্জীবনের কাব্যে ডোমেরা বাঁশ ও বেতের কাজের সহায়ক হিসাবে দা ব্যবহার করেছে। যেমন –

"ঋষির বচনে কালু না থাকিল রয়া।
করণ্ডি গঢ়ায় কালু হাতে দাঅ লয়া॥" (ঐ/২৮)

জেলেরা মাছ ধরার কাজে বঁড়শি, খালই, পলই, জাল ইত্যাদি ব্যবহার করত —

"খালই পলই জাল: পাথি পাটা সর্ব্বকাল : হইা বিনু নাহি সম্ভাবনা।" (ক্ষেমানন্দ/১৪৫)

বিজয়গুপ্তের কাব্যে গোদার বঁড়শি ও ছিপে মাছ ধরার প্রসঙ্গ পাই।

যুদ্ধাস্ত্র ঃ মনসামঙ্গল যুদ্ধবিগ্রহের কাব্য নয়, এবং যুদ্ধ বর্ণনার অবকাশও কম। তবু হাসন-হোসেনের সঙ্গে মনসার যুদ্ধ, নারায়ণ দেব ও বিজয় গুপ্তের কাব্যে যমযুদ্ধ, সাহে রাজার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের যুদ্ধ, ক্ষেমানন্দের কাব্যে

মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধ, কার্তিকের সঙ্গে যাদবগণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাণ রাজার যুদ্ধের বর্ণনা পাই। ঘটনাগুলি কবি কল্পিত সন্দেহ নাই, কিন্তু এই যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে সেকালে ব্যবহৃত যুদ্ধাস্ত্রের কথা পাই, যেমন লাঠি, মুদগর, তীর, ধনুক ইত্যাদি। মধ্যযুগে যুদ্ধে কামান ও বন্দুকের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে হাসন-হোসেনের সঙ্গে মনসার যুদ্ধে কামান ব্যবহারের কথা পাই —

"কামানে পুরিয়া গোলা গাড়ির উপর তোলা
সাজে তাহা জত গোলদার।
. . . . . .
বন্দুকি ধানুকি জত নানা অস্ত্রে বিভূষিত
হাসন হুসেন বেড়ি খানা।" (বিপ্রদাস/৬৯)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে এবং পরবর্তীকালে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নে মহেশ্বর জ্বর ও বৈষ্ণব জ্বরের যুদ্ধে বোধ হয় জীবাণু যুদ্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দ এই যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন —

"শিবজ্বর-বাণ তবে এড়ে বাণরায়।
অস্থির হইলা হরি, জ্বর আইল গায়॥
জ্বরেতে অস্থির বড় দেব দামোদর।
বিষ্ণুজ্বর-বাণ এড়ে তাহার উপর॥" (ক্ষেমানন্দ/২১৯)

সাজ-সজ্জা ঃ মঙ্গলকাব্যগুলিতে লোকজীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। পোশাক-পরিচ্ছদ, গহনা বা অলঙ্কার, প্রসাধন ইত্যাদির সুন্দর বর্ণনা আছে এখানে। মধ্যযুগে বাঙালী নারীরা প্রধানত শাড়ী এবং পুরুষরা ধুতি, চাদর, গামছা পরিধান করত। নারায়ণ দেবের কাব্যে 'বস্তুবদল' অংশে শাড়ীর কথা পাওয়া যায়। যেমন —

"বার হাতি সণের সাড়ি দিল সদাগর।
তাহারে লইয়া গেল বাড়ির ভিতর॥
পরিয়া সণের সাড়ি দাড়াইল রাণি পাস।
নারায়ণ দেব কয় মনসার দাস॥" (নারায়ণ / ১৮৩)

বিজয় গুপ্তের কাব্যে চাঁদকে ছলনা করতে যাবার আগে মনসা পট্ট বসন পরিধান করে —

"পরিয়া পট বসন অঙ্গে দিব্য আভরণ
দধি লইয়া বিস্তর।" (বিজয়/১৬৯)

ক্ষেমানন্দের কাব্যের বিবরণে আছে—

"যাইতে ওঝার বাড়ী : পরিলা পাটের শাড়ী : সুরঙ্গ সিন্দূর দিয়া ভালে।" (ক্ষেমানন্দ/১৮১)

বস্ত্র হিসাবে গামছার ব্যবহার দেখা যায়। স্নানের সময় গা মোছার বস্ত্র হল গামছা। যেমন —

"স্নান করিলে থাকিতে পার আমার সংহতি॥
গামছা নাহিক মোর এই বাক্য ধর।
এ বুঝিয়া মহারাজা মোরে আজ্ঞা কর॥
. . . . . .
গামছা পাইয়া পদ্মা হরষিত হইল।
ততক্ষণে পদ্মাবতী উঠিয়া লড় দিল॥" (বিজয়/১৬১-১৬২)

পুরুষরা ধুতি নামে এক খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করত, অন্তর্বাস হিসাবে ইজার ব্যবহার করত। যেমন চাঁদের বাণিজ্যবদল অংশের বর্ণনায় - "চটের ইজার দিল চটের পাছরা।" (নারায়ণ/১৮৩)

বিপ্রদাসের কাব্যে হাসান-হোসেন পালায় পাই –

"কামড় খাইল পেটে ইজার ভিতরে॥
আশ্চম্বিতে পেটে জেন পড়ে বজ্রাঘাত।
ইজার চিরিয়া মিনা পেটে দেই হাথ॥"(বিপ্রদাস/৬৪)

নারীরা বক্ষাবরণ হিসাবে কাঁচুলি ব্যবহার করত। যেমন জগজ্জীবনের কাব্যে পাই —

"ভাঙ্গিল পরিধান শাড়ী পাএর নপুর॥
চিণ্ডিলা গলার হার ছিড়িল কাচুল।
ভাঙ্গিল নাকের নথ কর্ণের কর্ণফুল॥" (জগজ্জীবন/৩৯)

আবার মনসার সজ্জা বর্ণনায় পাই — "মঙ্গলিয়া বোড়া দেবীর হৃদয়ে কাঁচুলি।"(বিপ্রদাস/২)

তাছাড়া নারীরা ঘাঘরা, সায়া ইত্যাদি ব্যবহার করত। ধনীরা সুন্দর করে বিছানা সাজিয়ে বাসগৃহের সৌন্দর্য বাড়াত। উৎসব-অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্বণে চাঁদোয়া টাঙ্গানো হত। যেমন চাঁদ সদাগর মনসা পূজার সময় আপন নামে চাঁদোয়া সেলাই করে মনসার উপরে টাঙ্গিয়ে দিয়েছিল—

"আাপনার নামে চান্দো সিয়াই চান্দুয়া।
পদ্মার উপরে চান্দো দিলেন টাঙ্গিয়া॥" (ঐ/৩৫৫)

সেকালের শয্যা নির্মাণের কথা পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে। ধনীরা সুদৃশ্য সুরম্য শয্যায় শয়ন করত; খাট-পালঙ্ক, বালিশ, মশারি ইত্যাদি শয্যা নির্মাণের উপকরণ। বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে শয্যা নির্মাণের কথা পাই -

"সাত ভাইয়ের সাত পুরী নানামত রঙ্গি।
তার মধ্যে বালাখানা বেহুলার টঙ্গি।
বিনা দীপে প্রকাশ করয়ে তার তেজে।
চক্র চান্দোয়া ভাল নানা চিত্র সাজে॥
বিছানা করেছে তাহা সোণার পালঙ্কে।
শিয়রে পার্শ্বেতে সগ্রিদা দিয়া নানা রঙ্গে॥
দশাঙ্গ ধূপের ধূঁয়া অগুরু জ্বালিয়া।
কয়রায় টানিয়াছে খোটা জাল দিয়া॥" (বংশীদাস / ১৮২)

মধ্যযুগে পায়ে দেওয়ার জন্য প্রধানত খড়ম ব্যবহার করা হত। নানা ধরনের জুতার ব্যবহার থাকলেও ব্রাহ্মণ, সাধু-সন্ন্যাসী এবং সাধারণ মানুষ খড়ম ব্যবহার করত। লখীন্দরের বিবাহকালে খড়ম পায়ে দিতে দেখা যাচ্ছে –

"সোণার খড়ম আনি দাসে আগে ধরে।
খড়ম পায়ে দিয়া গেল বরশয্যা ঘরে॥" (ঐ)

লখীন্দরের বিবাহকালে লোহার মাঞ্জসে যে শয্যা নির্মাণ করা হয়েছিল তাতে শীতলপাটির ব্যবহার আছে –

"কাড়য়ারে চারি খুঁটি, বিছানে শীতলপাটী,
লেপ নেহালি নানা রঙ্গে।
লেপ গ্রিদা সুন্দর, বিছানেতে পট্টাম্বর,
শয্যা কৈল সোণার পালঙ্কে॥"(ঐ / ১৬৬)

অতঃপর আসি গহনা ও অলঙ্কারের কথায়; বাঙালী নারীরা অলঙ্কার প্রিয়, মঙ্গলকাব্যে অলঙ্কার-বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে অলঙ্কারপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে বিশেষত নারীরা নানা রকম

অলঙ্কারের দ্বারা নিজেকে সুসজ্জিত করে তুলত। যে সমস্ত অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় সেগুলি হল,— গলার সুতলি, হার, মাথার মণি, চাকী, বলি, পাসুলি, শাঁখা, মল, কানের দুল বা কুণ্ডল, অঙ্গুরীয়, নাকের বেশর, নথ বা নোলক, খাড়ু ইত্যাদি। নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলার বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কারের পরিচয় পাওয়া যায় —

"সূর্য্যওল দুই জেন কর্ণের কুণ্ডল।
সুবন্তের চাকি বলি তাহার উপর॥
গলায়ে পরিল বেউলা নব লক্ষের হার।
বাহুতে পরিল বেউলা সুবন্তের চাইর তাড়॥
আভের কাকৈ দিয়া পাইট কৈল সিথি।
নাসিকা উপরে দিলা রত্ন গজমতি॥
তোড়ল-মল পরিলা নূপুর চরনে।
সংসার মুহিত করে বেউলার সাজনে॥" (নারায়ণ /৪২)

আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশা বা বাইশ কবির মনসামঙ্গলে 'মনসার সর্পসজ্জা' বর্ণনায় সেকালে ব্যবহৃত নানা অলঙ্কারের পরিচয় পাই। হরি দত্তের বর্ণনা অনুসারে —

"বিচিত্র নাগে করে দেবী গলার সূতলি।
শ্বেত নাগে করে দেবী বুকের কাঁচুলি॥
অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বেত নাগে করে দেবী কাঁকালি কাছুনি॥
সোনা নাগে দেবী করিলা চাকী বলি।
মকর নাগে করে দেবী পায়ের পাসুলি॥
কর্কট নাগে পদ্মার গলার হার।
অঙ্গুরি হইল তবে নাগ ব্রহ্মজাল॥
দুই হস্তের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
মণিময় নাগ শোভে সুন্দর কিঙ্কিণী॥
সখিগুয়া নাগে করিল হাতের তাড়।" (বাইশা/১-২)

জগজ্জীবনের কাব্যে পার্বতীর বিবাহের সাজসজ্জা বর্ণনায় বৈচিত্র্য লক্ষণীয় —

"অরুণ মকর বেঢ়ি যেন শরদ ইন্দু।
চাকি কোঢ়ি মকর কুণ্ডল শ্রুতিমূলে॥
নাসিকাতে বেসর যেন মুক্তাফুল দুলে॥
হৃদয়ে কাচুলি পহ্রে দীপ্ত করে জ্যোতি।
মণি মুকুতা পহ্রে প্রবাল গজমোতি॥
চরণে নপুর পহ্রে করে ঝলমল।
দুই চক্ষ শোভা করে কমল উৎপল॥" (জগজ্জীবন /৬৬)

বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে শুধু নারীরাই নয়, পুরুষরাও ব্যবহার করত বিভিন্ন ধরনের অলঙ্কার। লখীন্দরের বিবাহে তাকে নানা রকম অলঙ্কার পরানো হয় —

"বিবাহে কুমার লড়ে বাপের কৌতুক বাড়ে

নানামতে সাজয়ে কুমার।
সুবর্ণ টোপর মাথে কনক অঙ্গুরি হাতে
গলে মণি মুকুতার হার।
বিরমল খারু পায়ে কনকের খারু তায়ে
সুবর্ণের কুণ্ডল দিল কানে॥" (বিজয়/৩৬৫)

বিবাহকালে টোপর একটি বিশিষ্ট অলঙ্কার, শোলা নির্মিত টোপর ব্যবহার হলেও ধনীরা সুবর্ণ টোপরও ব্যবহার করত। মণি, মুক্তা, প্রবাল, গজমোতি ইত্যাদি মূল্যবান পাথর ব্যবহার করত অলঙ্কার তৈরীতে। সমাজের সাধারণ মানুষ, সাধু-সন্ন্যাসীরা অনেক অনাড়ম্বর জীবনযাপন করত, সাধারণ পোশাক ও গহনা ব্যবহার করত। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাকড়ি, রসকাঠি ইত্যাদি ব্যবহার করত। বেহুলা ডোম নারীর বেশ ধারণ করলে –

"রূপার মাকড়ী কানে ঘন ঘন দোলে।
ডাগর রসের কাঁঠি গাঁথ্যা দিল গলে॥" (ক্ষেমানন্দ / ২৮৫)

সাধু-সন্ন্যাসীরা বাঘছাল, কৌপিন, রুদ্রাক্ষ পরিধান করত, কমণ্ডলু ও ত্রিশূল ধারণ করত। অনেকে হাতে খাড়ু ও কানে কুণ্ডল ব্যবহার করত।

মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালীর প্রসাধন ও রূপচর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসাধন দ্রব্য হিসাবে সিন্দুর, চুয়া, চন্দন, কস্তুরী, কুঙ্কুম, অগুরু, কাজল, হরিদ্রা, আলতা, আমলকি, বিভিন্ন প্রকার গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তেল, তিল তেল, নারায়ণ তেল ইত্যাদি রূপচর্চার জন্য ব্যবহৃত হত। এ বিষয়ে দুটি অন্যতম সহায়ক জিনিস হল দর্পণ ও চিরুণী। যেমন বিজয় গুপ্তের কাব্যে আছে লখীন্দরের রূপচর্চার কথা-

"তিল তৈল আমলকি গিলা হরিদ্রা মিশালি।
লেপিয়া লখাইর অঙ্গে কৌতুকে জল ঢালি॥" (বিজয়/৩৬৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার বিবাহে রূপচর্চার কিছু অংশ —

"হরিদ্রা বাটিয়া দিল বেহুলার গায়।
নারায়ণ তৈল দিল তাহার মাথায়॥
সোনার চিরণী দিয়া আঁচড়িল কেশ।
বিবিধ বন্ধানে সভে করে তারা বেশ॥" (ক্ষেমানন্দ/২৫০)

আমলকি, বাটা হলুদ, তিল তেল, চন্দন দিয়ে অঙ্গ মার্জনা করত, অনেক সময় বিশেষত বিবাহকালে পুরুষরাও অঙ্গ মার্জনা করে রূপচর্চা করত। যেমন লখীন্দরের বিবাহে —

"হরিদ্রা মাখিয়া হৈল কাঞ্চনের জুতি।
পরিধান করিল হরিদ্রাযুত ধুতি॥
মকর-কুণ্ডল কানে ঘন ঘন দোলে।
প্রবাল মুকুতা হার-শোভে তার গলে॥" (ঐ/২৪৮)

নারীরা নানা ছাঁদে খোপা বাঁধত, কেশ বিন্যাস করত, যেমন দেবখণ্ডে দুর্গার বিবাহে —

"কাকোই আনিয়া দুর্গার আচুড়িল কেশ॥
বান্ধিল মাথার কেশ দেবী নানা ছন্দে।
অমূল্য সোনার ঝাপা পৃষ্ঠ-পরে বান্ধে॥" (জগজ্জীবন/৬৬)

বাঙালী নারীরা কত রকমের খোঁপা বাঁধতে পারত তার বর্ণনা দিয়েছেন নারায়ণ দেব, যেমন— 'বাঙ্গালি বেহার', 'নববেহার', 'দেবমহল' 'পচিমা বেহার' ইত্যাদি। কবির বর্ণনায়—

"বাঙ্গালি বেহার খোপা লাগিল বান্ধিতে।

... ...

নববেহার খোপা না দেখিয়া ভাল।

দেবমহল খোপা লাগে বান্ধিবার॥

পচিমা বেহার খোপা ঊষার ভাতি।

কেসের গোড়েতে দিল সোনা রূপার পাতি॥" (নারায়ণ /৪২)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই নারায়ণ তেল ব্যবহারের কথা —

"সুবর্ণ চিরণী লয়্যা : নারায়ণ তৈল দিয়া : বন্ধানে বান্ধিল কেশভার।" (ক্ষেমানন্দ/১৫৩)

মেয়েরা মাথার খোপায় ফুলের মালা পরিধান করত, যেমন —

"জাতী যূথী দেহ মোরে গন্ধরাজ চাঁপা।

মালাপুষ্প দেহ মোরে রঙ্গে বান্ধি খোঁপা॥" (ঐ)

নারীপুরুষ উভয়েই ধূপের ধোঁয়া দিয়ে চুল শুকাত, চুলে অগুরু, চন্দন, কস্তুরী মাখত। যেমন –

"আগর চন্দন চুয়া কস্তুরি বিশেষ।

ধূপের ধুয়া দিয়া শুখায়ে মাথার কেশ॥" (বিজয়/৩৬৩)

মেয়েরা চোখে কাজল ব্যবহার করত, কালনাগিনী তাই মনসার চোখের কাজল হয়েছে। যেমন –

"কালি-নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।" (বিপ্রদাস/২)

শিল্পকর্ম ঃ মধ্যযুগের লোকসমাজের মানুষ তাদের বোধ-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের শিল্পবস্তু তৈরী করত। মনসামঙ্গলে মধ্যযুগীয় বাঙালীর শিল্প দক্ষতার পরিচয় আছে তাদের ব্যবহার্য শিল্প উপকরণে, যেমন— আসন তৈরী করা, শোলার কাজ, কাঁথা তৈরী, সূচিশিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ ইত্যাদি। মঙ্গলকাব্যে দেবীর কাঁচুলি নির্মাণ একটি বিশেষ প্রসঙ্গ; বাঙালী নারীরা ঘরে বসেই রঙবেরঙের সুতার সাহায্যে চিত্র অঙ্কন করত, কাঁচুলি নির্মাণে তার পরিচয় পাই –

"বিচিত্র কাঁচুলি তবে করিল নির্মাণ।

এ তিন ভুবনে জত বৈসে চরাচর

দেবাসুর নাগ নর লিখিল সকল।" (ঐ/১১)

নক্শীকাঁথা ও কাঁচুলিতে লতাপাতা, ফুল, পশুপাখি ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারতের পৌরাণিক কাহিনী সুঁই সুতার কারুকার্যে চিত্রিত হত। কার্পাস, রেশম, পাটের আঁশ থেকে তৈরী হত বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র— শাড়ী, চট, চাঁদোয়া, পাছড়া, মশারি, দুলিচা, বিছানা, পালঙ্ক-পোষ, সামিয়ানা, বালিশ ইত্যাদি। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যবদল বর্ণনায় এরকম বর্ণনা পাচ্ছি —

"চটের কাবাই দিল চটের কমরবেড়া।

চটের ইজার দিল চটের পাছড়া॥

আউট গজ খুঞিয়া দিয়া মাথায় বান্দিল।

বোকড়া পিন্দিয়া রাজা বড় হরসিত হৈল।" (নায়ায়ণ/১৮৩)

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণেও এর বিস্তৃত পরিচয় পাই —

"দিঘল পসর যত বড় বড় গড়া।

চিত্র বিচিত্র যত রাঙ্গা পাটের ডুরা॥

রাঙ্গা পাটের থুপ ফুল সারি সারি।

চটের চান্দোয়া খসায় চটের মশারি॥
চটের দুলিচা খসায় চটের বিছান।
চটের তাবুগ্রিদা খসায় আর সামিয়ান॥
চটের পালঙ্কপোষ চটের বন্দিস।
চটের ইজারবন্দ চটের বালিশ।" (বংশীদাস/১৩৪)

বাংলার বস্ত্রশিল্প কত উন্নত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ক্ষেমানন্দের কাব্যে। বিভিন্ন প্রকার সূক্ষ্ম বস্ত্র, যেমন ক্ষীরোদ, তসর, ক্ষোম, রতন, অম্বর, রেশমী, তসর, সোনাগাই, পট্টবাস ইত্যাদির উল্লেখ আছে এখানে। বাংলার মসলিন এক সময় বিখ্যাত ছিল, যেমন মনসা পরিহিত শাড়ী মসলিন হতে পারে। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় –

"বহুত বসন লয়্যা ধরিল যোগান॥
ক্ষীরোদ তসর ক্ষোম রতন অম্বর।
না ভায় দেবীর মনে রেশমী তসর॥
সোনাগাই পট্টবাস পেলাইল দূরে।
আপনে বাছিয়া বস্ত্র বিষহরি পরে॥
রূপার পড়্যান তার হেম গুণাটান।
বিশ্বকর্ম্মা বুন্যাছিল সেই বস্ত্রখান॥
মাপিলে শতেক হাথ সমান বসন।
মুঠিতে রাখিতে পারে গুড়াই যখন॥
... ...
লইল সুরঙ্গ বস্ত্র আপন ইচ্ছায়।
সূর্য্যের কিরণ হেন জুতি করে গায়॥" (ক্ষেমানন্দ/১৫৩)

শোলার টোপর নির্মাণ বাংলার একটি বিশেষ কারুশিল্প। প্রসঙ্গত স্মরণীয় টোপর নির্মাণ মঙ্গল কাব্যের একটি বিশেষ প্রসঙ্গ। বাংলার শিল্পীরা শোলার শিল্পে কিরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করেছিল তার পরিচয় পাই মনসামঙ্গলে। প্রধানত মহিলারা ঘরে বসে এই শিল্পকর্ম করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মহিলা শিল্পী কাজলা মালিনীর কথা পাওয়া যায়। লখীন্দরের বিবাহ উপলক্ষে টোপর নির্মাণের বর্ণনায় ক্ষেমানন্দ লিখেছেন —

"কাজলারে ডাক্যা সাধু তারে দিল পান।
কাজলা মাল্যানী করে মউর নির্ম্মাণ॥
নানা চিত্র করে তায় লিখে নানা ফুল।
সোনার টোপর করে হেম সমতুল॥
... ...
মউর আনিঞা দিল সাধু-সন্নিধান
নানা ধনে সাধু তারে করিল সম্মান॥" (ঐ/২৪৭)

শোলার বিভিন্ন গহনা অর্থাৎ সাজসজ্জা বা ডাকের সাজ তৈরী বাংলার বিশিষ্ট শিল্প, এছাড়া অলঙ্কার শিল্প, শঙ্খশিল্প, অলঙ্করণ শিল্প, কারুকার্যময় বস্ত্র নির্মাণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। লখীন্দরের বিবাহকালে কারুকার্যময় পাটের শাড়ী, কারুকার্যময় শঙ্খ, চিরুণী উপহার দেওয়া হয়েছিল। যেমন -

"অধিবাসের দির্ব করি বিবিধ প্রকার।
সুন্দর পাটের সাড়ি নানা অলঙ্কার॥

বিচিত্র নির্মাণ শঙ্খ কনক-চিরনি।
সুবর্ণ-সাপুড়া পুরি নানা রত্ন মণি॥" (বিপ্রদাস/১৭৮)

সোনারূপার গহনা রাখার জন্য কারুকার্যময় সাঁপুড়া বা কৌটা তৈরী করা হত। বাঁশ ও বেতের কাজ বাংলার প্রাচীন কুটীর শিল্প। বাংলার অন্ত্যজ শ্রেণীর নারী পুরুষরা বাঁশ ও বেত দিয়ে গৃহস্থালীর উপযোগী ডালা, কুলা, ঝাঁপি, সাজি, তালপাতার পাখা বা বিয়নী, ধুচুনি, চুপড়ি তৈরী করত। বিপ্রদাসের কাব্যে বিয়নী ও টোকা তৈরীর কথা পাই। বংশীদাসের কাব্যেও খাগ কেটে বিউনি বোনার বিবরণ আছে। যেমন –

"শুনিয়া বেহুলা বাণী, পাছে লখাই পাটনী,
বিউনি বোনে কাঁচা খাগ আনি।
লখায়ের আদেশ পায়্যা, খাগ আনে কাটিয়া,
বেতি তুলি বুনিল বিউনি॥" (বংশীদাস/২৪২)

নারায়ণ দেব, ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবনের কাব্যে ব্যজনী বা বিচনি নির্মাণের কথা আছে –

"কামিলা বন্ধানী : গড়িছে বিয়নী : শুধু সুবর্ণের ডাঁটি
বিয়নী দেখিয়া : স্থির নহে হিয়া :পবন মানিল ভাটি॥"(ক্ষেমানন্দ/২৮৪)

সাধারণত ডোম ও বাগদীরাই বাঁশ ও বেতের কাজ করত, ক্ষেমানন্দের কাব্যে ডোমনী বেশধারী বেহুলা ছদ্ম পরিচয়ে বলেছে—

"অতি কুলহীন মোরা হই ডোম জাতি॥
ধুচনি চুপড়ি বুনি আর বুনি ডালা।
সিয়নী বিয়নী বুনি আর বুনি কুলা॥
নগরে বেচিয়া বুলি জাতি অনুসারে।" (ঐ/২৮৬)

জগজ্জীবনের কাব্যে ডোমের সাজি বা করণ্ডি তৈরীর প্রসঙ্গ পাই –

"চিরিয়া বাঁশের পোর করিলেক পাতি।
গঢ়িয়া করণ্ডিখানি বান্ধিলেক বাতি॥
তলে তিন খুরা দিল ধরিবার কাজে।
করণ্ডি লইয়া গেল ঋষির সাক্ষাতে॥" (জগজ্জীবন/২৯)

আলপনা অঙ্কন নারীদের বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। উৎসব, পূজা-পার্বণ, বিবাহ উপলক্ষে মণ্ডপে, ঘরের বারান্দায়, পিঁড়িতে মেয়েরা আলপনা অঙ্কন করত। ব্রতাচারের বিশিষ্ট অঙ্গ আলপনা অঙ্কন। পশু, পাখি, লতা, পাতা, ফুল ছাড়াও ব্রতের কামনানুযায়ী আলপনা শিল্পের বিশেষত্ব ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে আলপনা অঙ্কনের কথা পাই —

"ছবি চিত্র আলিম্পনা দেখিতে সুন্দর।
সিজের পল্লব দিল ঘটের উপর॥" (বিপ্রদাস/২২৯)

তাছাড়া উদ্যান নির্মাণ, গৃহনির্মাণ ইত্যাদিতে বাঙালীর কৌম বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত। চাঁদের বাগান-নির্মাণ, জগজ্জীবনের কাব্যে শিবের উদ্যান-নির্মাণ কিংবা স্বর্গের দেবমন্দির-নির্মাণ, লখীন্দরের বাসরঘর- নির্মাণ, মন্দির-নির্মাণে বাঙালীর গৃহনির্মাণ পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। স্তম্ভ করা, চৌকাট, কপাট, প্রাচীর তৈরী, ছাদের উপর সুবর্ণ কলস স্থাপন, নেতের পতাকা দেওয়া মধ্যযুগীয় বাস্তুবিদ্যা ও লোকায়ত শিল্পরীতির পরিচায়ক। মৃৎশিল্প বাংলার বিখ্যাত শিল্প. তার পরিচয়ও ঐতিহাসিক।

বাদ্যযন্ত্র ঃ বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রাচীনকাল থেকেই জনসমাজে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বণ, নবজাতকের জন্ম, নামকরণ, চূড়াকরণ, বিবাহ উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হত। মনসামঙ্গলে বিভিন্ন

প্রকার বাদ্যযন্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন - ঢাক, ঢোল, বীণা, মৃদঙ্গ, শঙ্খ, শিঙ্গা, করতাল, বেণুবীণা, বাঁশি, পিনাক, সাহিনী, কবিনাস, সপ্তস্বরা, মোহরি, ঝাঁঝর, নূপুর, দুন্দুভি, মরুজ বীণা, ঘন্টা, বিষাণ, ভেরী, রবাব, পাখোয়াজ, মন্দিরা ইত্যাদি তারের তৈরী বাদ্যযন্ত্র, ধাতব বাদ্যযন্ত্র, চামড়া আচ্ছাদিত বাদ্যযন্ত্র ও বায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন মনসার বিবাহ উপলক্ষে উল্লিখিত নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র –

"দুন্দভি মরুজ পড়া বীণা করতাল।
ঝাঝরি মুহরি বাজে মৃদঙ্গ রসাল॥
ভেউর করনাল বাজে ডিণ্ডিম কাহাল।
দুসরি বাজয়ে ঘন অতি সে রসাল॥
কপিলাস ঘন্টা আর বাজয়ে মন্দিরা।
দুসরি মঙ্গলা আর বাজে সপ্তসরা॥" (বিপ্রদাস/৪৩)

লখীন্দরের বিবাহ উপলক্ষে বাদ্যযন্ত্রের তালিকা পাওয়া যায় জগজ্জীবনের কাব্যে, যেমন —

"নানা জাতি বাদ্য বাজে থরে থরে বাদ্য সাজে
দামা ভেউর বাজে করতাল।
জোড়া পঢ়া বীণা বাঁশী দগড় মান্দল কাসি
শঙ্খ শিঙ্গা মৃদঙ্গ করনাল॥
ঢাকা কাঢ়া আর ঢোল মহাশব্দে গণ্ডগোল
বেণু বীণা পিনাক সাহিনী।
কবিনাস সপ্ত স্বরি স্বর মণ্ডল মোহরী
বাজে বাদ্য দশ অক্ষৌহিণী॥"(জগজ্জীবন/১৭৮)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও মনসার বিবাহে নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় –

"ঘন বাজে জয়ঢোল : ঝনঝন ঝিকিরোল : দামা দড়মসা জয়ঢাক।
বাজে শঙ্খ সিন্ধুয়ান : কাঁসি বাঁশী খরসান : পাখাজুয়া দেই ঘন পাক॥
রসাল মৃদঙ্গ পড়া : সানি বেণী বাজে কাড়া : রবাবীতে রবাব বাজায়।
সঘন ফুকরে ডম্ফ : ভূতল হইল কম্প : কিন্নর কিন্নরী গীত গায়॥"(ক্ষেমানন্দ/৭৮)

যুদ্ধবিগ্রহ ও শোভাযাত্রাকালে রণবাদ্য বাজানো হত; ঢাক, ঢোল, কাঁসি, দামামা, রামশিঙ্গা, দগড়, সানাই, জগঝম্প ইত্যাদি রণবাদ্য হিসাবে চিহ্নিত। যেমন নারায়ণ দেবের কাব্যে চন্দ্রধরের সঙ্গে সাহে- রাজার যুদ্ধ অংশে —

"দামামাতে বাড়ি পরে মেঘের গর্জনে।
ঢাক ঢোল বাড়ি পড়ে না সুনি শ্রবণে॥" (নারায়ণ/২৫২)

অথবা — "রণ জিনিয়া চান্দো বাজায় ঢাক ঢোল।" (ঐ /২৫৩)

অথবা — "জয়ঢাক চান্দো বাজায় কুতুহলে।" (ঐ)

বিবাহ বা উৎসব অনুষ্ঠানে বাজী পোড়ানো হত। বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রীদের সঙ্গে বাজী পোড়াবার জন্য বাজীকররাও সমবেত ছিল। চরকি, তুবড়ি, হাউই ইত্যাদি বাজীর বিবরণ পাওয়া যায় –

"বাজী ভরি প্রচুর নড়িল বাজীকর
হাউই মন্দীরে বাজী দীপক প্রচুর॥
ভূঁইচাপা তুবড়ি চরখি অগণন।
চাদর লইল কুমুরিকা অসংখ্যান॥" (বিপ্রদাস/১৮৪)

যানবাহন ঃ এরপর আসা যাক্ যানবাহনের কথায়, মধ্যযুগীয় সমাজে যে সমস্ত লোকযান ব্যবহৃত হত তার কথা জানা যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। প্রধানত দু'ধরনের যান ব্যবহৃত হত, নৌযান বা জলযান এবং স্থলযান। জলযান হল নৌকা এবং ভেলা বা মাঞ্জস আর স্থলযান হল গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী, পালকী, চতুর্দোল ইত্যাদি। মনসামঙ্গলে অত্যন্ত সুপরিচিত হল চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী। চাঁদ সদাগরের বৈদেশিক বাণিজ্য সুদূরকালের স্মৃতি বিজড়িত হলেও বাণিজ্য ও যাতায়াতের অন্যতম যানবাহন নৌকা এবং বাণিজ্য জাহাজ বলতে বড় বড় পালতোলা নৌকাকে বোঝাত। নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকার ব্যবহার অত্যন্ত সুলভ। মনসামঙ্গলের কবিগণ চাঁদ সদাগরের চৌদ্দডিঙা বাণিজ্য তরীর পরিচয় দিয়েছেন, কোথাও বা সপ্তডিঙা মধুকরের বর্ণনা দিয়েছেন। বিপ্রদাসের বর্ণানুসারে-

"গন্ধেশ্বরী প্রথমে বরিল সাবধানে।
অনেক ছাগল করিয়া বলিদানে॥
... ...
দ্বিতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে সর্বজয়া।
দু-লক্ষ তঙ্কার দ্রব্য তাহাতে ভরিয়া॥
তৃতীয় মেলিল ডিঙ্গা নামে জগদ্দল।
বারো বরিষের ধরে তণ্ডুল সম্বল॥
চতুর্থ মেলিল ডিঙ্গা নাম সুমঙ্গল।
জার রূপে দুই কূলে হইল উজ্জ্বল॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে নবরত্ন।
জার রূপ দেখিতে দেবের হয় যত্ন॥
সষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে চিত্ররেখা।
জার ধনে আদি অন্ত নাই লেখা জোখা॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নামে শশিমুখী।
বহু দূর হৈতে যার ছইঘর দেখি॥" (ঐ/১৪২)

বংশীদাসের কাব্যে চৌদ্দডিঙা বাণিজ্যতরীর নাম পাওয়া যায়, যেমন – মধুকর, শঙ্খচূর, রত্নসাত, খরসান, দুর্গার, আগলপাগল, চৌয়াঠুটী, লক্ষ্মীপাশা, উদয়তারা, মাণিক্য, মেড়ুয়া, চন্দনপাট, কাজলরেখি, হংসবল, সাগরফেণা ইত্যাদি। এগুলি থেকে সেকালে জলপথে যোগযোগের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়। সাধারণ মানুষ খেয়া তরীতে পারাপার করত; ডোম ও পাটনীরা খেয়া পার করত, মনসামঙ্গলে তার বিবরণ আছে। জলযান হিসাবে ভেলা বা মাঞ্জসের ব্যবহার অতি প্রাচীন। সাধারণত কয়েকটি কলাগাছ পাশাপাশি সাজিয়ে আড়াআড়ি ভাবে একটি বাঁশ ঢুকিয়ে দিয়ে ভেলা তৈরী করা হয়। মনসামঙ্গলে ভেলা ব্যবহারের কথা পাওয়া যাচ্ছে; বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে ভেলার ব্যবহার প্রসিদ্ধ। লখীন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু হলে বেহুলা বলেছে —

"মাজষ ভাসাএ আমা দেও ভাসাইয়া।
মনসা গোচরে জাবো মৃত পতি লইয়া॥" (ঐ/২০৫)

ভেলা পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে 'ভুরা' নামে পরিচিত। নারায়ণ দেবের কাব্যে ভুরার কথা পাই। চাঁদসদাগর লখীন্দরকে ভাসিয়ে দিয়ে বলেছে —

"ভুরা ভাসাইয়া দিল তিন ঢেউ পানি।
খায়াছিনু তোর ধার লইয়া জাও কানি॥" (নারায়ণ/৯১)

স্থলযান হিসাবে চতুর্দোল ব্যবহার হত। অভিজাত ধনী ঘরের নারী-পুরুষরা চতুর্দোল ও পালকী ব্যবহার করত।

বেহারারা কাঁধে করে পালকী ও চতুর্দোল বহন করত। বিবাহ, উৎসব অনুষ্ঠানে চতুর্দোল ব্যবহৃত হত। লখীন্দরের বিবাহে চতুর্দোল সুসজ্জিত করা হয়েছে –

"চারু চতুর্দোলে নানা প্রকারে সাজিয়া।
ছত্রিশ আশ্রমে নড়ে তথি আরোহিয়া॥" (বিপ্রদাস/১৭৮)

জগজ্জীবনের কাব্যে দেবখণ্ডে দুর্গার বিবাহে চতুর্দোলে দুর্গাকে বের করা হয়েছিল - "চৌদোলে বাহিরায় দুর্গা মোহিনী-আকার।" (জগজ্জীবন/৬৬)। বেশীরভাগক্ষেত্রেই স্থলপথে যোগাযোগের মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ী, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করত। জগজ্জীবনের বর্ণনানুসারে —

"রাজপথে সরোবর বন ঝাড় নহে।
নিরন্তর হস্তী ঘোড়া পথ দিয়া বহে॥" (জগজ্জীবন/১৭০)

কিংবা, বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহ যাত্রাকালের চিত্র —

"হস্তীর উপরে ভর, সাজিলেক, লখিন্দর,
বিবাহ করিতে হরষিতে।
নট ভাট ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি কুটুম্বগণ,
বেড়িয়া চলিছে সমুদিতে॥
হস্তী ঘোড়ায় রথে, সবে চলে হরষিতে,
পায়েতে হাঁটিয়া কেহ যায়।
চৌদল পালঙ্ক ভাল, শতে শতে লোক পাল,
কেহ চলে সুবর্ণ দোলায়॥
.....
পার হইয়া নদ-নদী, নায়ে চড়ে নিরবধি,
স্থানে স্থানে যায় লোক বৈয়া।" (বংশীদাস/১৭০)

সংস্কার ও বিশ্বাস-কেন্দ্রিক উপাদানঃ অতঃপর আসা যাক্ সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, অনুষ্ঠান-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির আলোচনায়। মানুষের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার-বিচার, লোকাচার যুগ যুগ ধরে প্রচারিত ও প্রতিপালিত একটি সমাজ-মানসের সমন্বিত রূপ। এর মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে একটি সামগ্রিক জাতি সত্তা। এই উপাদানগুলিকে সমাজ ইতিহাসের অন্তর্গত করা যেতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্যে বাঙালী মানসের এই রূপ আনুপূর্বিক বিবৃত হয়েছে। সমাজ ইতিহাসের অঙ্গ হিসাবে উপাদানগুলি আলোচিত হল।

তিন বঙ্গের মনসামঙ্গলে এই সংস্কার-বিশ্বাসের নিগড়ে আবদ্ধ বাংলাদেশের ছবি পাওয়া যায়। হাঁচি-জিটির বাঁধন, কাকের ডাক, ঝাড়ফুঁক, তুকতাক্, মারণ-উচাটন, বশীকরণ-সম্মোহন, তান্ত্রিকতার বাঁধন ছিল পদে পদে। পাঁজি-পুথির প্রতি এক জাতীয় বিশ্বাস কাজ করেছিল, স্বপ্নদর্শন, অভিশাপ, আশীর্বাদ এসবের প্রতি আস্থা ছিল প্রবল। অদৃষ্টবাদী বাঙালী হাঁচি-টিকটিকির বাঁধনকে বিশ্বাস করত, এসবের দ্বারা তাই শুভাশুভ নির্ধারিত করত। যেমন বিপ্রদাসের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রাকালে 'জেটী' অর্থাৎ টিকটিকির ডাক অমঙ্গল নির্দেশ করে। কবির কথায় —

"হাঁচি জেটী পড়ে জবে যাত্রা করে রায়
সনকা রমণী কর হানয়ে মাথায়।" (বিপ্রদাস/১৪০)

শুধু তাই নয়, যাত্রাকালে বাম দিকে কালসাপ, দক্ষিণ দিকে শৃগাল দেখা অমঙ্গলসূচক। ক্ষেমানন্দের কাব্যেও চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে হাঁচি-জেটীর বাধা পড়ে —

"এত বলি সনকায় : সাধু সফরেতে যায় : পাছে পড়ে হাঁচি জেঠী বাধা।" (ক্ষেমানন্দ/২২৩)

মাথার উপর শকুনি বা গোধিকা ডাকা অমঙ্গল সূচক, যেমন –

"নাসিকা পরশ করি যাত্রা করে অধিকারী।
সুবর্ণ ঘট পড়িল টলিয়া।
চরণে উঝটি লাগে সগুনি আইল আগে
শৃগাল যায় দক্ষিণভাগে॥" (জগজ্জীবন/১২৫)

লখীন্দরের বিবাহ যাত্রাকালে মাথার উপর গোধিকা ডাকে –

"গমনে গোধিকা ডাকে মস্তক-উপর॥
দৈবের কারণে তাহা কেন নাঞি শুনে।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৮)

এসব পশুপাখি-কেন্দ্রিক সংস্কার ছাড়াও আছে অঙ্গভঙ্গি-কেন্দ্রিক সংস্কার, যেমন — হাঁচি পড়া, অঙ্গ-স্পন্দন ইত্যাদি। আবার আছে ঘটনা-কেন্দ্রিক সংস্কারও, যেমন— যাত্রাকালে হোঁচট লাগা, চোখে কানামাছি পড়া, মাথায় ঘরের চাল ঠেকা অশুভকর বা অযাত্রা। আবার দিন বা বার-কেন্দ্রিক সংস্কারও আছে। নারায়ণ দেবের কাব্যে বাণিজ্য যাত্রাকালে চাঁদের বাম নাকে শ্বাস বয়, বাম চক্ষু স্পন্দিত হয়, যা অশুভকর। তাই সনকা চাঁদ সদাগরকে যাত্রা-অযাত্রা সম্পর্কে সাবধান করে দেয় —

"চলিলেক সদাগর দক্ষিণ সফর
হরসিতে করিল গমন।
বাম নাকে বহে সর প্রাণ করে ধরপড়
বাম চক্ষু কম্পীঞে ঘন ঘন॥
দুই হস্তে জোড় করি বোলে সোনাঞী সুন্দরী
শুন প্রভু নারির বচন।
এহিত বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে জায় জেবা নরে
জাতি প্রাণ না রহয় ধন॥
এহি রবিবার দিনে লঙ্কার রাজা রাবণে
মদগর্ভে সিতা কৈল চুরি।
ধনে বংসে সংহার শ্রীরামে করিল তার
সমবারে পড়িল দসগীরী॥
মঙ্গল বুধ দুই বার দুই করী বোলে সংসার
ইয়াতে জে জায় সফরে।
ধনে বংসে নিদ্ধণ কয় জত মুণীজন
ভাগ্যে সে তাহার প্রাণ ধরে॥" (নারায়ণ/১৫৬-১৫৭)

পক্ষান্তরে মঙ্গল নির্দেশক লক্ষণও পাওয়া যায়, যেমন যাত্রাকালে জ্বলন্ত প্রদীপ, জলপূর্ণ ঘট, সুগন্ধি ফুল, উতলানো ভাত, তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র, কচি ধানের চারা দেখা ইত্যাদি। আবার ডান চক্ষু স্পন্দিত হওয়া শুভ ঘটনার নির্দেশক। বেহুলা দেবলোকে যাত্রাকালে কতকগুলি মঙ্গলসূচক চিহ্ন নির্দেশিত করে যায়, যা দেখে সকলে মঙ্গল-অমঙ্গল বুঝতে পারবে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলা সনকাকে বলেছে —

"কড়ার তৈলেতে রামা প্রদীপ জ্বালিয়া।
শাশুড়ীর তরে যায় বিশেষ বলিয়া॥

কড়ার তৈলেতে দীপ ছমাস জ্বলিবে।
তবে সে জানিবে মনে লখীন্দর জীবে॥
সিজানা ধান্যেতে যদি অঙ্কুর নিঃসরে।
মরা পুত্র জীয়ন্ত বসিয়া পাবে ঘরে॥
... ...
অঙ্গারে বাসর ঘরে ময়ূর লিখিয়া।
শাশুড়ীর তরে যায় বিশেষ বলিয়া॥
ছয় মাস বই যদি শিখী পুচ্ছ ধরে।
তবে সে জানিবে মনে প্রভু আইসে ঘরে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৬১)

যাত্রাকালে মঙ্গলধ্বনি উচ্চারণ করা হত, সম্মুখে মঙ্গলঘট স্থাপন করা হত, যেমন —

"যাত্রা করি পাটনে চলেন মহাশয়।
সমুখেতে পূর্ণ ঘট করি আরোপণ
পুরোহিতগণ বেদ করে উচ্চারণ।
নানা বাদ্য হুলাহুলি করে শঙ্খধ্বনি
যাত্রা করিয়া চলে চাঁদো নৃপমুনি।" (বিপ্রদাস/১৪০)

এ ছাড়াও বহু রকমের সংস্কার আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা ছিল, যেমন— ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাই গোয়ালে খাবার খাওয়া, গরু-বাছুরকে ঝাঁটা নিক্ষেপ করা, মাথায় কাপড় না দিয়ে গোয়ালে যাওয়া, চালের বাতা ধরে ঝোলা অমঙ্গল সূচক (ক্ষেমানন্দ/৩৪)। আবার গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, অশূদ্রের নীল বস্ত্র পরিধান করা, কুইলা বলদ গোয়ালে রাখা পাপ বলে বিবেচিত হত। বিষ্ণু পালের কাব্যে তাই ঊষা মনসাকে দিয়ে প্রতিশ্রুতি করিয়েছে জন্মান্তরে মনসা তাকে দিয়ে এসমস্ত কাজ করাবে না। কবির বর্ণনানুসারে —

"গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা সুরাপান করে।
তুমি না তরাল্যে বাছা সেই পাপ ধরে॥
শূদ্র না হইঞা যেবা নীল বস্ত্র পরে।
তুমি না তরাইলে বাছা সেই পাপ ধরে॥
কুইলা বলদ যেবা রাখিবে গোহালে।
তুমি না রাখিলে বাছা সেই পাপ ধরে॥" (বিষ্ণুপাল / ৬৫)

স্বপ্নদর্শনকে গুরুত্ব দেওয়া হত এবং সত্য বলে মনে করা হত। তাই দেখা যায় চাঁদকে দেবী চণ্ডী স্বপ্নে যে নির্দেশ দেয় তা পালন করতে চাঁদ-মনসার শত্রুতা শুরু হয়। চাঁদের ছয় পুত্রবধূ রাত্রে অমঙ্গল সূচক স্বপ্ন দেখে— এক ভীষণাকৃতি পুরুষ ছয় ভাইকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। এই স্বপ্ন সত্যি হয় ছয় পুত্রের মৃত্যুতে।যেমন—

"বধূগণে বলে, 'মাতা, শুনহ বচন।
রাত্রিশেষে মোরা আজি দেখিলাম স্বপন॥
কালবর্ণ পুরুষ এক হাতে দীর্ঘ কুড়ি।
তামার শলা হেন চুল, দেখি গোঁপ-দাড়ি॥
পরিধানে বস্ত্র নাই, বিপরীত অঙ্গ।
বিপরীত বেশ তার, হাতে লোহার শার্ঙ্গ।
... ...

আচম্বিতে হেন স্বপন দেখিলাম বিকট।
মনে বড় ভয় বাসি বড়ই সঙ্কট॥" (বাইশা/১২১)

বিপ্রদাসের কাব্যে মনসা চাঁদ সদাগরকে ভয়ানক স্বপ্নদর্শন করিয়েছে, এতে চাঁদ সদাগর অত্যন্ত ভীত হয়েছে এবং ধন্বন্তরি ওঝার কাছে ব্যক্ত করেছে —

"জ্ঞানহত শোকাকুলি আছিনু শয়নে
দেখিনু কুচ্ছিত স্বপ্ন মহাভয় মনে।
নাগরূপা কন্যা এক বসিয়া শিয়রে
প্রচুর ভূজঙ্গে সঙ্গে অতি ভয়ঙ্করে।
অধিক বাড়িল ত্রাস হইনু মুর্ছিত
ইহার উপায় ওঝা করহ তুরিত।
প্রাণতুল্য নাখরা জিয়ায়্যা দেহ মোরে
তবে যে হইব স্বাস্তি মোর কলেবরে।" (বিপ্রদাস/৯৫)

বাঙালী আজন্ম জন্মান্তরবাদী, তাই জন্মান্তরের প্রতি বিশ্বাস ছিল এবং একারণে দৈববাদ তাদের নিয়ন্ত্রিত করত। চাঁদ সদাগর জন্মান্তরেই মনসার সঙ্গে বিবাদের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বেহুলা জন্মান্তরেই মনসার পূজা প্রচারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পূর্বজন্মের কথা মনে করা যায় অর্থাৎ জাতিস্মর হওয়া যায় বলে বিশ্বাস ছিল। আবার আশীর্বাদ ও অভিশাপের প্রতিও বিশ্বাস ছিল। সাধারণত ধান-দূর্বা দ্বারা আশীর্বাদ করার রীতি প্রচলিত ছিল। গুরুজনদের আশীর্বাদ যেমন ফলপ্রসূ তেমনি অভিশাপও ভয়াবহ হত। তাই মনসামঙ্গলে মনসার অভিশাপে ঊষাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। আবার দেখি বেহুলাকে বিধবা ব্রাহ্মণী বেশধারী মনসা যে অভিশাপ দেয় তাও সত্যে পরিণত হয়েছে।

তন্ত্র-মন্ত্র, মারণ-উচাটন, বশীকরণ-সম্মোহন, ঔষধীকরণ, ঝাড়ফুঁক-তুক্‌তাক্ এসবের প্রতি মানুষের এক জাতীয় বিশ্বাস ছিল। ওঝা, গুণীন, গণৎকার, দৈবজ্ঞের প্রতিও এক জাতীয় বিশ্বাস কাজ করত। তাই দেখা যায় বিবাহকালে কনের মাতা জামাতা বশীকরণের ঔষধ করে, আবার কনে স্বয়ং পতি বশীকরণের ঔষধ করে। নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলা স্বামী বশীকরণের ঔষধ করছে-

"সুমুখে রহিল বেউলা ঔসদ করিবার।
নানা মতে ঔসদ বেউলা লাগে করিবার॥
পুষ্প ছিড়ি ডাহিন বামে ফালাএ উড়াইয়া।
আর পুষ্প বিপুলা বসিল পাড়িয়া॥
... ...
দর্পণ বদল কৈল সাহের কুমারি।
ডরে করি লইল বেউলা সাইজ ছয় কুড়ি॥
লখাইরে ডেঞোইয়া মাইজ ফেলায় চতুর্দিগে।
পানে করি হস্ত লেপন দিল পিষ্টে বুকে॥
হেট মাথা হইয়া লখাই ডাহিন বামে চায়।
জয়ধরে লখাইর হাতে গামছা জোগায়॥
গামছা লইয়া ঔসদ লাগে মুছিবার।
কন্যা বরে তোলা তুলি হইল সাতবার॥" (নারায়ণ/৪৪-৪৫)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও ঔষধ করার প্রসঙ্গ পাই —

"অনেক ঔষধ : করিয়া পরিচ্ছদ : বেহুলা দিল পতি-ভালে।
সুন্দর লখীন্দরে : বরণ করি তারে : অমলা বাণ্যানী চলে॥"(ক্ষেমানন্দ /২৫১)

বরণকালে কনের মাতাও জামাতা বশীকরণের ঔষধ করত, কোথাও বা নব জামাতাকে খাওয়ানোর সময় বশীকরণের ঔষধ করা হত। জগজ্জীবনের কাব্যে পাই –

"মিষ্টি পরমান্ন দধি মধু আন
যত দ্রব্য দিল পাছে।
ঔষধের তর করিল অন্তর
রাখিল থালের কাছে॥" (জগজ্জীবন/২০২)

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে সনকার সখীরা তাকে জামাতা বশীকরণের পদ্ধতি দিয়েছে —

"যোড় গুয়া যোড় পান মক্ষিকা মাকড়।
উভত নোঙ্গেরার ছাল মানের শিকড়॥
একত্র বাটিয়া পুনঃ কেশে দেহ জড়ি।
এক তিলে জামাই যে নাহি যাবে ছাড়ি॥
... ...
আর সখী বলে আমার ঔষধের গুণে।
বার হলে ঘরে আসে দুই চারি দিনে॥
শ্মশানের জল আর কলসের মাটি।
পুরাণ কাঞ্জির রস একত্রেতে বাটি॥
গেঁঠুলিতে বান্ধিয়া রাখিও বামপাশে।
হাজার দোষ পায় যদি মুখ চেয়ে হাসে॥
... ...
কাঁকড়ার বামহাত ইন্দুর পিত্তিতে।
পেঁচার বাম চক্ষু দিয়া কাজল রাত্রিতে॥
বাম চক্ষুতে দিবে অঙ্গুলি করিয়া।
গালি পাড়িলেও থাকে পেঁচা মত চাইয়া॥
আর সখী বলে আমি ফুলপড়া জানি।
যদি শুঁকাইতে পার যত্ন করি আনি॥
পুষ্প মধু খেয়ে যেন ভ্রমরা মোহিত।
এইমত স্বামী যে না ছাড়ে কদাচিত॥" (বংশীদাস / ১৭৭)

অদৃষ্টনির্ভর বাঙালী সমাজে ওঝা, গণৎকার, দৈবজ্ঞদের প্রভাব ছিল। কিছু কিছু দৈবজ্ঞরা সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে ঈশ্বর সাধনা করত আবার অনেকে সংসার ধর্ম পালন করত। অনেকে সন্ন্যাসীর মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে জীবিকা নির্বাহ করত। সমাজে তাদের প্রতিপত্তি ছিল, কারণ অশিক্ষিত জনসমাজ তাদের শ্রদ্ধা করত। বিবাহ, পূজাপাঠ, যাত্রাকালে দৈবজ্ঞ বা গণৎকারদের সাহায্যে শুভাশুভ নির্ধারণ করা হত। বিবাহের দিনক্ষণ নির্ণয়ে দৈবজ্ঞরা পাঁজি-পুথি মিলিয়ে, গণ, রাশি বিচার করে যোটক নির্ধারণ করত। লখীন্দরের বিবাহের দিনক্ষণ নির্ণয়ের জন্য দিনক্ষণ দেখে যাত্রা করা হয়েছিল। সোমাই পণ্ডিতের কথা অনুযায়ী —

"দুই প্রহর বেলা হইল শুভক্ষণ।
যাত্রা করিয়া চলে সাধুর নন্দন॥
পূর্ব্ব[ব]ষু নক্ষত্র আর তিথি একাদশী।
লিখিয়া লইল লখাইর নক্ষত্র আর রাশি॥
জোগ করন ভাল দিন বুধবার।
যাত্রা করিয়া চলে সাধুর কুমার॥" (বিজয়/৩১৯)

দৈবজ্ঞ, গণৎকাররা অনেক সময় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পার্শ্বচরের মত থাকত। যাত্রাকালে তারা যাত্রা-অযাত্রা নির্ণয় করত। চাঁদ সদাগরের পার্শ্বচর গণক, দৈবজ্ঞগণ লখীন্দরের বিবাহ সম্বন্ধের সময়েও সঙ্গে গিয়েছিল —

"দৈবজ্ঞ আসিয়াছিলো রাজার সংহতি
করে পাঁজী লৈয়া লগ্ন কৈল শীঘ্রগতি।" (বিপ্রদাস/১৭৪)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহের লগ্ন নির্ণয়ে গণক জনার্দন রাশি বিচার করে —

"গণক আনিঞা ভূমে পাতাইল খড়ি॥
দৈববশে দুইরাশে হইল মিলন।
পরম হরিষ হৈল দ্বিজ জনার্দ্দন॥" (ক্ষেমানন্দ/২৪২)

আবার স্বগোত্রে বিবাহ বারণ ছিল। তাই চাঁদ সদাগর লখীন্দরের বিবাহে ঘটককে বলেছিল —

"চান্দ বলে স্বগোত্রেতে উচিত না হয়।" (বংশীদাস/১৫৮)

চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে গণৎকারগণ অযাত্রা নির্ণয় করেছিল, তা ফলপ্রসূ হয়েছিল। দৈবজ্ঞ বা গণৎকারদের সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত বলেই মনসা গণৎকার বা দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ করে সনকাকে ছলনা করে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে মনসা গণৎকার দৈবজ্ঞ সেজে সনকাকে ছলনা করে এবং বলে, আজ তার বাড়ীতে চুরি হবে। কবির বর্ণনায়—

"কপালে কাটিয়া ফোঁটা কক্ষতলে পুঁথি।
চাঁদের বাড়ীতে আগে গেলেন জগতী।
দৈবজ্ঞ দেখিয়া দিল বসিতে আসন।
ভূমেতে পাতিয়া খড়ি করিল গণন॥
দৈবজ্ঞ বলেন শুন সনকা সুন্দরী।
নিশ্চয় তোমার বাড়ী আজি হব চুরি॥" (ক্ষেমানন্দ/২৩৯)

মনসার মন্ত্রী নেতাকেও বার বার খড়ি পেতে গণনা করতে দেখা যায়। এক প্রকার সহজাত বিশ্বাস থাকায় মানুষ অনেক সময় এদের দ্বারা নানাভাবে প্রতারিত হত। সেকালের সমাজে দৈবজ্ঞ-গণৎকারদের মত পুরোহিতদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তারা সর্বদা যে সৎ হত তা নয়, বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর দৈবজ্ঞ যথাশাস্ত্র অগ্নিকার্য করার উপদেশ দিলে চাঁদসদাগর বলে — "দক্ষিণার লোভে সবে বলে অনুচিত।" (বিপ্রদাস/১৩২)। আবার সোমাই পণ্ডিত চাঁদকে মনসাপূজা করতে বললে চাঁদ সদাগর বলে —

"না বুঝিয়া সর্বলোক বলে অনোচিত
দক্ষিণার লোভে বলে সোমাই পণ্ডিত।" (বিপ্রদাস/২২৮)

এটাই বোধ হয় প্রকৃত অবস্থা। শুধু হিন্দুসমাজেই নয় মুসলমান সমাজেও পীর, দরবেশ, গাজী, মোল্লা, ফকিরদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল, সেই সঙ্গে ছিল পাঁজি-পুথি ও শাস্ত্রীয় বিধানের প্রতি আনুগত্য।

আবার পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়, মঙ্গল-অমঙ্গলের প্রতিকারার্থে দৈবজ্ঞ বা পুরোহিতরা বিধান দিত; এই ভাবে তারা

সমাজজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। বেহুলার বাসরে স্বামীর মৃত্যু তার পাপের ফল, আবার বেহুলার দাদা ভগ্নিকে কু-প্রস্তাব দেয়, এ পাপ থেকে নিষ্কৃতির বিধান বেহুলার মুখে হলেও যেন পুরোহিত ব্রাহ্মণের বিধানের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন বেহুলা তার ভাইদের বলেছে —

"যতেক অকথ্য কথা কহিলাঙ চিত্তে।
সে সকল পাপ রহিল খণ্ডিবে কেমতে॥
বালী বোলে না কান্দ দাদা শুন সদাগর।
প্রায়শ্চিত্ত করিহ দাদা উজানি নগর॥
উচ্চে দিঅ সরোবর নীচে দিঅ আলি।
ব্রাহ্মণকে দিহ ধেনু উত্তম দুধালি॥
অন্ন দেহ দাদা গ্রীষ্মকালে পানি।
বস্ত্রদান করিহ বিবস্ত্র জন আনি॥
ব্রাহ্মণকে আনি দাদা করাবে ভোজন।
তবে সে তুমার পাপ হৈবে বিমোচন॥"(জগজ্জীবন/২৮৫)

বলাই বাহুল্য এই সামাজিক শিক্ষা ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণের স্বার্থে। সত্যাসত্য, পাপপুণ্য বোধে মানুষের আস্থা ছিল, তাই 'তিন সত্য' করলে তা লঙ্ঘন করা মহাপাপ মনে করা হত। বিষ্ণু পালের কাব্যে দেখি উষা মনসাকে দিয়ে 'তিন সত্য' করিয়েছে যে, মর্ত্যে মনসা তাকে সাহায্য করবে। আসলে এ সব ঘটনাগুলি সমকালীন সমাজ মানসের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়া, মনসামঙ্গলে এই ক্রিয়ারই প্রতিফলন ঘটেছে।

মনসামঙ্গলে তৎকালীন বাঙালী সমাজের বহুবিচিত্র প্রবণতার চিত্র পাওয়া যায়— যা সমাজ ইতিহাসেরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে যেগুলি আজও পরিবর্তিত হয়নি। সমাজ ভঙ্গী পরিবর্তিত হলেও সমাজ রীতি বদলে যায়নি, যেমন পিতৃশ্রাদ্ধের পর বা অশৌচান্তে মাছ খাওয়া, শনিবারে, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ব্রত উৎযাপন করা, মৃতদেহ যথা নিয়মে অগ্নি সংস্কার করা ইত্যাদি। সঙ্কর গাড়রী মৃত্যুকালে তার দেহ আট টুক্‌রো করে আট দিকে পুঁতে দিতে বলেছিল। কিন্তু মনসা ব্রাহ্মণ বেশে তাকে 'যবন আচার' বলে নিন্দা করে। মনসার উদ্দেশ্য যাই হোক, হিন্দুর মৃতদেহ দাহ করাই রীতি, আবার সাপের কামড়ে মৃত্যু হলে মৃতদেহ দাহ করা নিষিদ্ধ ছিল। এছাড়াও গবেষকগণ নানা গবেষণার দ্বারা সর্পপূজা, সর্পসংস্কৃতি, সর্প সম্পর্কে বিভিন্ন সংস্কার, এসবের মধ্যে থেকে নানা নৃতাত্ত্বিক পরিচয় উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন।

বঙ্গদেশীয় সমাজে অতি প্রাচীনকাল থেকেই নানা সংস্কার, আচার-বিচার পালিত হয়ে থাকে। নবজাতকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানা আচার পালিত হত, যেমন প্রসূতির গর্ভকালীন আচার, প্রসবকালীন আচার, নবজাতকের জন্মকালীন আচার, বিবাহকালীন আচার, মৃত্যুতেও নানা আচার পালিত হত; এসব আচারে অবশ্য অঞ্চল বিশেষে ভিন্নতা ছিল। তিন বঙ্গের মনসামঙ্গল কাব্যে এই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। প্রসূতির ছয় বা সাত মাসের গর্ভাবস্থায় তার রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন রকম সুখাদ্য খাওয়ানো হত এবং নানা রকম স্ত্রী-আচার পালিত হত। প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজন নারীরা সমবেত হয়ে নানা দ্রব্য উপহার সহযোগে প্রসূতিকে সাধভক্ষণ করাত। মনসামঙ্গলে সাধভক্ষণের বিস্তৃত বিবরণ আছে; যেমন সনকার সাধভক্ষণ সম্পর্কে বিজয় গুপ্ত লিখেছেন —

"রাজ্যের ঠাকুর চান্দো সোনা তার রাণী।
সাধ খাওয়াইতে আনে যতেক বাণ্যানি॥
স্নান করিয়া সোনাই চড়াইল রন্ধন।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।" (বিজয়/২৯৮)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও সনকার সাধ ভক্ষণের কথা পাই—

"সপ্তমাস গর্ভ : লোকে জানে সর্ব্ব : শুন সখী বলি তোরে।
এমন দিবসে : মনের হরিষে : সাধ খায়াইবে মোরে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৩৭)

জগজ্জীবনের কাব্যে পাঁচ মাস গর্ভকালে পঞ্চামৃত এবং বিপ্রদাসের কাব্যে নয় মাসে সাধভক্ষণের কথা পাওয়া যায়। যেমন জগজ্জীবনের বর্ণনায় —

"পঞ্চ মাসে পঞ্চামৃত খায় বানিয়ানী।
দশ মাস দশ দিনে হইল পুত্রখানি॥" (জগজ্জীবন/১৫৯)

কখনো প্রসূতির ছয় মাস গর্ভকালে ষষ্ঠীপূজা করা হত। যেমন—

"ষষ্ঠী পোজে সনকা ষষ্ট মাস পাইয়া।" (বিজয়/২৩৭)

সেকালে সন্তানের জন্মকালে দাই বা ধাই বা ধাত্রী-মাতাদের প্রভাব ছিল। প্রসবকালে তারাই যাবতীয় কাজ করত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে লখীন্দরের জন্মকালে রতি বলে এক ধাই এর কথা পাওয়া যাচ্ছে। নবজাতকের জন্মকালে সমবেত প্রতিবেশী ও আত্মীয়া নারীরা উলুধ্বনি সহকারে নবজাতককে বরণ করে নিত। সন্তান প্রসবের পর প্রসূতিকে সূতিকাগৃহ বা আঁতুরঘরে রাখা হত, নবজাতককে ভূত-প্রেত ও কুদৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য নানা তন্ত্র -মন্ত্র, ঔষধ দ্বারা আবদ্ধ করা হত। দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ নবজাতকের কোষ্ঠী তৈরী করত। তারপর পঞ্চম দিবস থেকে নানা সংস্কার পালিত হত। দেশাচার অনুযায়ী এ সমস্ত লোকাচারে বিভিন্নতা থাকে। যেমন পূর্ববঙ্গের কবি বিজয় গুপ্তের বিবরণ অনুযায়ী ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা, সাত দিনে উঠানি, ছয় মাসে অন্নপ্রাশন, পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ করানো হত। দক্ষিণবঙ্গের কবি বিপ্রদাসের কাব্যেও তার সুন্দর বর্ণনা পাই, এখানে ছয় দিনে সুতিকাপূজা, আট দিনে আটকলাই, নয় দিনে নত্তা, ত্রিশ দিনে অশৌচান্ত, একত্রিশ দিনে ষষ্ঠীপূজার কথা পাই। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দাই সন্তানের মস্তক ও নাসিকা তোলার জন্য অঙ্গ মার্জনা করত। বিপ্রদাসের বর্ণনানুযায়ী —

"তবে অঙ্গ মার্জিয়া মস্তক নাসা তুলি
নাভি সুকর্তন কৈল দিয়া হুলাহলি।
কুমারিকা লতায় সুতিকা-ঘর বেড়ি
নানা মহোষধিতে গুমুড় দ্বারে এড়ি।
তাঁতি দিয়া নিবন্ধন করিল কুমারে
প্রভাতে পাচন দিল বিধি-লোকাচারে।
দৈবজ্ঞ আনিয়া কোষ্ঠী তুলিল তাহার
গণিয়া দৈবজ্ঞ কোষ্ঠী প্রশংসে অপার।
ছয় দিনে সুতিকা পূজিল সুবিধান।
অষ্ট দিনে আটকলাই কৈল শিশুগণ।
নবম বাসরে নত্তা করিল হরিষে
ত্রিশ দিনে অশোচন্তি করিল বিশেষে।
একত্রিশ দিনে করে ষষ্ঠীর পূজন
নানা পরকারে কৈল নানা আয়োজন।" (বিপ্রদাস/১৫১)

কোথাও দেখা যায় পঞ্চম দিবসে নাপিত এসে নবজাতকের মস্তক মুণ্ডন করে যায়, তার পর ছয় দিনে 'ষাটিরা' বা ষষ্ঠীপূজা করে; বিশ্বাস এই যে, ঐ দিন বিধাতা নবজাতকের ললাট লিখন করে থাকে। তাই ঐ দিন শিয়রে 'মসীপত্র' রাখা হয় এবং প্রসূতি ভিন্ন কেউ কাছে থাকতে পারে না। ক্ষেমানন্দের কাব্যে এ সমস্ত তথ্য পাচ্ছি -

"সনকা হরিষে : পঞ্চম দিবসে : কৈল লোকাচার লর্ত্তা ॥
প্রতি ঘরাঘরি : নগরে নাগরী : ডাক্যা আনে ঝাউআ চেড়ী।
শুনিঞা নাপিত : মনে হরষিত : আইল সাধুর বাড়ী।
বসি নরসুন্দ : পরম আনন্দ : খেরু কৈল সভাকারে।
তৈলপিত রসা : অঙ্গে করি ভূষা : সভে গেল ঘরে ঘরে ॥
ছদিনে ষাট্টারা : করিল বাণ্যারা : বিহিত ষষ্ঠীর পূজা।
সনকা বাণ্যানী : নানা সজ্জ আনি : কিঙ্করে ডাকিল দ্বিজা ॥
সনকা সুন্দরী : ষষ্ঠীপূজা করি : যাহার যে নীত আছে।
হাতে খড়্গ লয়্যা : রহিল জাগিয়া : মসীপত্র থুয়্যা কাছে ॥
কথ রাত্রি গেলে : বিধি হেনকালে : লিখিতে আইলা ভালে।" (ক্ষেমানন্দ /২৩৮)

ছয় মাসে অন্নপ্রাশন বা নবজাতকের মুখে ভাত দেওয়া হত। এ উপলক্ষে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা হত, পুরোহিত নবজাতকের নামকরণ করত। ব্রাহ্মণকে দান ও জ্ঞাতি বন্ধুদের ভোজন করিয়ে নবজাতককে সমাজের একজন করে নেওয়া হত। যেমন বিপ্রদাসের বর্ণনায় –

"ছয় মাস হইল যদি রাজার নন্দন
অন্ন দিতে করিল প্রচুর আয়োজন।
শুভ দিন শুভ লগ্ন পায়্যা হরষিত
পুরোহিত আনাইল সোমাই পণ্ডিত।
... ...
দেবার্চনা কৈল তবে হরষিত-মনে
নান্দীমুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিল বিধানে।
নানারত্নবিভূষণ পুত্র কৈল কোলে
নানাবিধি বাদ্য বাজে মহাকোলাহলে।
শুভক্ষণে অন্ন দিল পুত্রের বদনে
লক্ষিন্দর নাম রাখে রাজার বিধানে।" (বিপ্রদাস/১৫১)।

বিবাহ মানবজীবনের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। নানান লোকাচার ও বিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে বিবাহ নামক অনুষ্ঠানটি পালিত হত। মনসামঙ্গলে বাঙালীর বিবাহরীতির সুন্দর বর্ণনা পাচ্ছি। বাঙালী হিন্দুর বিবাহাচার ক্রমান্বয়ে কতকগুলি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হত, যথাক্রমে অধিবাস – নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ – ক্ষৌরকর্ম - বর বরণ – সাতপাক – মালাবদল – শুভদৃষ্টি – সম্প্রদান – বাসরযাপন – শয্যা তোলা – বাসিবিয়ে – বধূবরণ - কালরাত্রি ইত্যাদি। অধিবাস নামক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিবাহাচার শুরু হত। বিবাহের দিন কোথাও বা পূর্বদিনে পাত্র বা পাত্রীর পিতা বা গুরুজন স্থানীয় ব্যক্তিরা ষোড়শমাতৃকাপূজা ও অধিবাস করাত। বিভিন্ন অঞ্চলে এ সমস্ত আচারগুলি পালিত হত নির্দিষ্ট কৌম বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। অধিবাসের পর এয়োগণ অথবা পুরোহিত পাত্রপাত্রীর হাতে হলুদ মাখানো সুতা পরিয়ে দিত। মনসার বিবাহে বিপ্রদাসের কাব্যের বর্ণনানুযায়ী—

"পরম উল্লাস পদ্মার অধিবাস
করিল জত আইয়-গণে
হরিদ্রা তৈল লৈয়া পদ্মার অঙ্গে দিয়া
বাঁধিল সূত্র বাম করে।" (ঐ /৪১)

এরপর জলসওয়া নামক অনুষ্ঠান; এয়োগণ বাদ্য সহকারে মঙ্গলগান গাইতে গাইতে জলসইতে যায়। কুলা বা চালুনিতে ধান, দূর্বা, কলা, সিন্দুর, প্রদীপ, হরিদ্রা, আম্রপল্লব যুক্ত জলপূর্ণ কলস নিয়ে এয়োরা জলসইতে যায়। লখীন্দরের বিবাহে 'পড়া আঁখিবার' বলে একটি অনুষ্ঠানের কথা বলেছেন বিপ্রদাস। এটিও জলসওয়া নামক অনুষ্ঠানেরই নাম —

"পড়া আঁখিবারে জায় সনকা সুন্দরী
ধান্য দূর্বা কদলি কুলায় পূর্ণ করি।
আইয়-গণ সঙ্গে লইয়া মঙ্গল বিধানে
যথাবিধি পড়া আখে আনন্দিত মনে।
হরিদ্রা শোভিত বাস আচ্ছাদন করি
বাম করে পূর্ণ ঝারি বারিপূর্ণ করি।
সুনাদ মঙ্গল বাদ্য শুনি জয়ধ্বনি
পুত্রের মঙ্গল বচে সনকা বাণ্যানী।
... ...
ধান্য দূর্বা সিন্দুরাদি সুগন্ধি চন্দনে
আখিলেন পড়া রামা লৌকিক বিধানে।" (ঐ / ১৮০-১৮১)

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে পূর্ববঙ্গীয় রীতি অনুযায়ী জলসওয়া অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে, এর নাম সম্ভবত 'সোহাগ সাধা'। বংশীদাসের বর্ণনানুযায়ী —

"মিলিয়া সকল নারীলোকে।
কেহ নাচে কেহ গায়, সোহাগ সাধিতে যায়,
বেহুলার বিহার কৌতুকে॥
... ...
বাড়ি বাড়ি উত্তরিয়া, ঘৃতের প্রদীপ দিয়া,
আলিপনা পাতিয়া দুয়ারে।
জিরা মরিচ লঙ্গ বাটি, খাসা চাউল গুটী গুটী,
লয় সজ্জা মঙ্গল জোকারে॥" (বংশীদাস / ১৭৫)

জলসইবার সময় এয়োরা মঙ্গলগান গেয়ে নৃত্য করে, শঙ্খধ্বনি ও জয়জোকার বা উলুধ্বনি দিয়ে গ্রামের পথ মুখরিত করে তুলত। এরপর পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ লাভের জন্য বর ও কনের পিতা নান্দীমুখ বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করে। এ উপলক্ষে ষোড়শমাতৃকাপূজা, গৌর্যাদিমাতৃকাপূজা করা হত, বিপ্রদাসের বর্ণনুসারে —

"স্নান দান করি সাহে বসিলা আসনে
প্রথমে গণেশ পূজে দ্বিজ সম্বিধানে।
ষোড়শ মাতৃকা পূজে হরষিত হইয়া
গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া।
বসুধারা নর-মাঝে দিলেক হরিষে
নান্দীমুখ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিল বিশেষে।" (বিপ্রদাস/১৮০)

বংশীদাসের কাব্যেও অনুরূপ বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে —

"ছায়া মণ্ডপ করি তাম্বু সামিয়ানে।

নান্দীমুখ করিবারে নানা দ্রব্য আনে॥

. . .   .

গৌর্য্যাদি মাতৃকাগণে ক্রমে ক্রমে পূজে॥

গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া।

দেবসেনা স্বাহা স্বধা লোকমাতৃ জয়া॥

শান্তি পুষ্টি তুষ্টি ক্ষমা দেবতার নাম।

পঞ্চ উপচারে পূজে অতি অনুপম॥

দধি দুগ্ধ ছানা আর নৈবেদ্য প্রমাণ।

পিতৃশ্রাদ্ধ করি কৈল নব পিণ্ডদান॥" (বংশীদাস/১৭৩)

বাঙালী হিন্দুর বিবাহে নাপিতের ভূমিকা থাকে। নাপিত এসে খেউরি করে যায় –

"নাপিতে খেউর কৈল   ঘৃতদীপ প্রজ্বালিল" (বিপ্রদাস/১৮১)

বংশীদাসের কাব্যে বর্ণনায় পাই –

"জয় জোকারে লখাইর হাতে দিল ক্ষুর॥

আর চারি নাপিতে নরুন লৈয়া হাতে।

পঞ্চ গোটা নখ কাটি ফেলিল নাপিতে॥"(বংশীদাস/১৭৩)

এর পরের আচার—গায়েহলুদ; এয়োগণ তিল তেল, আমলকি, বাটা হলুদ সহযোগে এক প্রকার মিশ্রণ তৈরী করে বর ও কনেকে মাথায় এবং এরপর স্নান করায়। যেমন —

"ঘাইট ঘিলা আমলকী,   হরিদ্রাদি তৈল মাখি,

তিন গুণ করিয়া সন্ধান।

দাসগণ সবে ধরি,   শরীর মার্জ্জন করি,

কাঁচা সোণা সমান সুঠাম॥

সুবর্ণ কলসি ভরি,   তীর্থজল সারি সারি,

শিরে ঢালে পঞ্চাশ কলসী।" (ঐ/১৭৪)

এয়োগণও তেল-হলুদ মাখে, স্নান করে, নানা উপহার লাভ করে। এরপর 'তিতাবস্ত্র' পরিত্যাগ করিয়ে বর-কনেকে সাজানো হয়। বর সুসজ্জিত হয়ে আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পুরোহিতের সঙ্গে কনে গৃহে যাত্রা করে। ক্ষেমানন্দ ও বিপ্রদাস 'আঠার বাকড়া' বলে একটি আচারের কথা বলেছেন। সম্ভবত বরযাত্রীরা কন্যার গ্রামে উপস্থিত হলে বালকরা বরের পথ আটকায় এবং 'আঠার বাকড়া' বলে আঠার জন বীরের কথা আবৃত্তি করে বরপক্ষের নিকট থেকে উপহার আদায় করে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে—

"আগু জায় সর্ব লোক একত্র হইয়া।

এখনি বাকড়া গুয়া লইব রহায়্যা।

. . .   .

চাঁদো বলে আঠারো বাকড়া নাম বলো

তবে গুয়া পান দিব না কর কোন্দল।" (বিপ্রদাস/১৮৫)

ক্ষেমানন্দের বর্ণানুসারে —

"যত শিশু মেলি : রাখিল খাটলি : আঠার বাকড়া বল্যা॥

কর পসারিয়া : পথ আগুলিয়া : আঠার বাকড়া পড়ে।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৯)

আঠার বাকড়া হল আঠার জন পৌরাণিক পুরুষ দেবতার নাম। এটি অবশ্যই একটি আঞ্চলিক রীতি। ওদিকে কনে রাঙা চেলি পরে সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করে থাকে। বর কনে গৃহে উপস্থিত হলে এয়োগণ স্ত্রী-আচার পালন করে থাকে। কন্যার পিতামাতা বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধদ্রব্য, অঙ্গুরীয়, মধুপর্ক উপহার দিয়ে বর বরণ করে থাকে। মনসার বিবাহে –

"বিবিধ বিধানে বরিল শিব জামাই লোকরিত তর্ক
মাল্য আভরণ গন্ধ পুষ্প দিয়া আর দিল মধুপর্ক॥" (বিজয়/৮১)

কোথাও বরের পা ধুইয়ে দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। বংশীদাসের বর্ণনায় —

"বরণের দ্রব্য যত আনে একে একে।
সুবর্ণের পাত্রে ভরি পরম কৌতুকে॥
সুবর্ণ কুণ্ডল হার সুবর্ণ বলয়া।
সুবর্ণ অঙ্গুরি আনে রত্নে বিভূষিয়া॥
... ...
পাদ্য আচমন দিল লখাইর হাতে।
হস্ত পাতি অর্ঘ্য লৈয়া তুলি দিল মাথে॥" (বংশীদাস/১৭৭)

কনের মাতা এই সুযোগে জামাতা বশীকরণের ঔষধ করে নিত। কন্যাগৃহে যথাশাস্ত্র স্ত্রী-আচার পালিত হত। কলাগাছ পুঁতে ছায়ামণ্ডপ তৈরী করা হত এবং কনেকে সুসজ্জিত করে ছায়ামণ্ডপে নিয়ে আসা হত। এদিকে কিছু লোক বরকে কাঁধে করে নিয়ে দাঁড়াত; কনে বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং তার পর বরের মুখের আবরণ সরিয়ে ছামনি বা শুভদৃষ্টি বা মুখচন্দ্রিকা করা হত এবং এই সঙ্গে কনে পতি বশীকরণের ঔষধ করার জন্য পান ও ফুল বরের মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে ফেলে। নারায়ণ দেবের বর্ণনানুসারে –

"বাহির হইল সুন্দরি বেউলা পাটেত চড়িয়া।
হরসিত হইল লখাই বেউলারে দেখিয়া॥
দস জন মাল আইল কাছিয়া কাপড়।
কান্দে করি লইল বর চান্দের কোঙর॥
আগে লখাই পাছে বেউলা সাত পাক ফিরি।
লক্ষিন্দরে রাখিলেক পূর্ব্ব মুখ করি॥
অন্তস্পট দুর করি মুখচন্দ্রিকা।
সুভ দিনে বেউলা লখাই হইয়া গেল দেখা।" (নায়ায়ণ/৪৪)

বিপ্রদাসের কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। এর পরের আচার—সম্প্রদান; কনের পিতা বা গুরুজন- স্থানীয় ব্যক্তি সম্প্রদান করে। বরকে ছায়ামণ্ডপে পূর্ব দিকে মুখ করে বসানো হত, বরের সম্মুখে কনেকে বসিয়ে বর ও কনের দুই হাত একত্রিত করে কুশ দ্বারা বেঁধে দেওয়া হত, কুশণ্ডিকা স্থানে অগ্নিসংযোগ করে বেদবাক্য উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে সম্প্রদানকার্য সম্পন্ন হত। শেষে অগ্নিতে ঘি ঢেলে কর্মসম্পাদন শেষ হলে ছায়ামণ্ডপ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়ে বর-কনে ঘরে তোলা হত। এই সময় বরকে নানা দ্রব্য উপহার দেওয়া হত। ধনীরা গ্রাম, ভূমি, গাভী, রজত, কাঞ্চন, দাসদাসী পর্যন্ত উপহার দিত। বংশীদাসের কাব্যে বিবাহের আনুপূর্বিক বর্ণনা পাওয়া যায়—

"ছায়ামণ্ডপে বর বৈসে পূর্ব্বমুখে।
কাছাকাছি কন্যা বৈসে জামাই সম্মুখে॥
কুশ হস্তে উত্তর মুখে বসিলেক কর্ত্তা।

কর্ম্ম করার পুরোহিত হাতে লৈয়া পৈতা ॥
অগ্নি স্থাপন করি কুশণ্ডিকা স্থান।
মহাবাক্য বলিয়া করিল সম্প্রদান ॥
... ...
গ্রন্থি বন্ধন করি যত দ্বিজগণে।
পাণিগ্রহণ করিলেক হরষিত মনে ॥
বরণ পূর্ব্বক যথা কূল পুরোহিত।
কুশণ্ডিকা করিয়া অগ্নিতে ঢালে ঘৃত ॥
এইমতে যথাবিধি কর্ম্ম সম্পাদিয়া।
হরষিতে ঘরে চলে কন্যা বর লৈয়া ॥
বরসজ্জা কৈল যেন আছে লোকাচার।
ঘুরুনি ঢাকোনি পুনঃ কৈল তিন বার ॥" (বংশীদাস/১৮০)

এরপর বর ও কনেকে ভোজন করানো হয় এবং ভোজনান্তে বাসর যাপন। বাসরঘরে উপস্থিত নারীদের হাস্য পরিহাস, রহস্যালাপ ও প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা চলে। পরের দিন বাসি বিবাহ। সকাল বেলা এয়োগণ বরের কাছে শয্যাতোলা বাবদ অর্থ আদায় করে, তাকে 'শয্যাতুলুনি' বলে। এয়োগণ কৃত্রিম পুকুর তৈরী করে, কোথাও বা বাঁশের কঞ্চি পুঁতে তার চারিদিকে আলপনা দেয়, বর-কনে সেখানে দাঁড়ায়। এয়োগণ এক জাতীয় মিশ্রণ তাদের মাখিয়ে স্নান করায়, তার পর পুকুরের জলে অর্ঘ্য প্রদান করে এবং পরে 'কড়িখেলা' হয়। বর-কনে মোট সাতবার কড়ি তোলে, শেষে পুকুর সাতবার প্রদক্ষিণ করে বিবাহ সমাপ্ত হয়। নারায়ণ দেবের বর্ণনানুযায়ী —

"কুপিয়া বাসের কুঞ্চি মনি মুক্তা প্রবাল সিছি
বেদি বেড়ি বিচিত্র আলিপন।
বাটি গিলা আমলকী লখাই বেউলার গায়ে মাখি
স্নান করায় জত নারিগণ ॥
. . . . . .
খাচিয়া পুখরি খানি ঢালিয়া ঝারির পানি
কড়া তোলা করে সাতবার।
সাহেব পুরহিত আনন্দে নির্ত্ত গিত
কড়া তোলা করিল সাতবার।
ধরিয়া লখাই বেউলার হাত বেদি বেড়ি সাতপাক
সুমক্ষ করে সাতবারে।" (নারায়ণ/৫৪)

বিবাহান্তে বর-কনে বিদায় গ্রহণ করে, কনে প্রথমবার পতিগৃহে উপনীত হলে পাত্রের মাতা নানা দ্রব্য উপহার দিয়ে ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে বধূবরণ করে। এই দিনের রাত্রি 'কালরাত্রি' রূপে পালিত হয়ে থাকে। পরদিন প্রীতিভোজনান্তে বধূকে সমাজের একজন করে নেওয়া হত। বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিবাহের বিস্তৃত বিবাহাচারের বর্ণনা আছে।

উত্তরবঙ্গীয় বিবাহরীতি একটু অন্যরকম; জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহের বর্ণনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন বিবাহের পাকাদেখা ও কথাবার্তা হয়ে যাবার পর কনের পিতা ও পাত্রের পিতা পরস্পর তুলসীপত্র বদল করে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হত।জগজ্জীবনের বর্ণনানুসারে—

"চান্দো বোলে যদ্যপি করিলে অঙ্গীকার।
তুলসীপত্রেক দেহ প্রত্যয় আমার॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন বাছো মহারঙ্গে বসি।
চান্দোর হস্তেতে বাছো দিলেন তুলসী॥
তুলসী পাইয়া চান্দো আনন্দিত মন।
আভরণ দিয়া করে কন্যা বরণ॥" (জগজ্জীবন/১৭৪)

অবশ্য দক্ষিণবঙ্গীয় কবি ক্ষেমানন্দের কাব্যেও 'তুলসীবদল' রীতি দেখা যায় —

"চতুর ঘটক ছিল জনার্দ্দন সাথে।
তুলসী আনিঞা দিল দুজনার হাথে॥
তুলসী বদল কৈল বিভার নির্ণয়।
লখীন্দরে কন্যা দিব সায়বাণ্যা কয়॥" (ক্ষেমানন্দ/২৪৪)

বিবাহরীতিতে এরূপ আঞ্চলিকতা ছিল। জগজ্জীবনের কাব্যে কন্যাকে ছায়ামণ্ডপে আনার পর কন্যা বরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে এবং প্রণাম করে, তারপর মহুয়ার ডাল গঙ্গাজলে ডুবিয়ে বর-কনে পরস্পরের প্রতি জল ছিঁটিয়ে দেয় এবং পরে দু'জনে পরস্পরের প্রতি ফুল ছিঁটিয়ে দেয়। জগজ্জীবনের বর্ণনানুযায়ী —

"স্বামী প্রদক্ষিণ করি বহিরায় সুন্দরী
কুন্দ পুষ্প নিঞ্চাচলে করি।
দেখিয়া দুহার মুখ দুহার পরম সুখ
দুহে দেখিল নয়ান ভরি॥
ফিরি ফিরি সপ্তবার করে কন্যা নমস্কার
সমুখে মুখানি নাই তুলে।
... ...
সুবর্ণ কলস আনি গঙ্গাসাগরের পানি
মহুকার ডাল লৈল হাতে।
ডুবায়া ঘাটের জলে বাদ্য বাজে সুমঙ্গলে
ছিটাইল দুজনার মাথে॥
ধরিয়া পুষ্পের মুঠি দুইজনে ছিটা ছিটি
মঙ্গল উৎসব করি মহারঙ্গে।" (জগজ্জীবন/১৯৬)

এরপর সম্প্রদান—বরের হাতে কনের হাত দিয়ে ঘটের উপর স্থাপন করে হাতের উপর ফল দিয়ে সম্প্রদানকার্য সম্পন্ন হত। তাছাড়া অন্যান্য আচারসমূহে কিছুটা মিল আছে, অবশ্য কবি সবটা বর্ণনাও করেননি।

জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু এই তিন নিয়ে মানব জীবনচক্র। জন্ম ও বিবাহের মত মৃত্যুর পরও মৃতের সন্তান-পরিজনেরা নানা লোকাচার পালন করে থাকে। সাধারণত পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই পিতার পারলৌকিক কর্মের অধিকারী, অবশ্য সন্তানের মৃত্যুতে পিতাই পারলৌকিক কর্ম সম্পাদন করে। তাই চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যুর পর পাত্র-মিত্র, পুরোহিত চাঁদ সদাগরকেই অগ্নিকার্য ও শ্রাদ্ধের বিধান দিয়েছে। বিপ্রদাসের কাব্যে পাই —

"মাজস গড়াও ঝাটো বলে চাঁদো রাজ।
ভাসাব কানির মড়া রাখিয়া কি কাজ॥
পাত্র মিত্র পুরোহিত বলে সম্বিধান।

অগ্নিকার্য্য শ্রাদ্ধ কর শাস্ত্রের বিধান॥" (বিপ্রদাস/১৩২)

স্বামীর মৃত্যুর পর সদ্য বিধবা স্ত্রীরও কিছু আচার পালন করতে হত। যেমন, সদ্য বিধবা স্ত্রীর হাতের শাঁখা ভেঙ্গে দিয়ে সিন্দুর মুছে দেওয়া হত এবং হাতের নখ কেটে দেওয়া হত—

"নাম্বিঞা বসিল বালী গগড়িঞার ঘাটে।
নাপিত আনিয়া কন্যা দশ নখ কাটে॥" (জগজ্জীবন/২৫৮)

সতীদাহ প্রচলিত থাকায় সতীরা বিবাহের সাজে সজ্জিত হয়ে আম্রডাল হাতে স্বামীর মৃতদেহের অনুগমন করত। শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাবার পর মৃতদেহকে গঙ্গাজলে স্নান করানো হত এবং অগুরু, চন্দন, ঘি মাখানো হত; ধনীরা চন্দন কাঠের চিতা ব্যবহার করত এবং বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করে জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্নি প্রদান করত। সাধারণত পুত্ররাই অগ্নিকার্য্যের অধিকারী হত। তাইতো লখীন্দরের মৃত্যুর পর সনকা বিলাপ করে বলেছে – "আমি মরিলে বাপু কে দিবে আগুনি।" (বিজয়/৪৩৩)। বস্তুত মৃতদেহ বাসি করাও সামাজিক দৃষ্টিতে অপরাধ ছিল। তাই লখীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ বলেছে —

"কান্দিতে কান্দিতে হইল দশ দণ্ড বেলা।
জ্ঞাতি লোকে খোটা দিব দ্বারে বাসি মড়া॥" (বিজয়/৪৩৬)

দাহকার্য শেষ হলে জল ঢেলে 'চুল্লি' শীতল করা হত । জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে দেবখণ্ডে ধর্মদেবের মৃত্যুর পর পুত্রেরা অগ্নিকার্য সম্পাদন করে এভাবে —

"আপনার উরু তুলি তাহাতে বান্ধিআ চুল্লি
বাপের করয়ে অগ্নিকাজ।
গঙ্গাসাগরের পানি আগর চন্দন আনি
ধর্ম্মদেবের শরীর ধোয়ায়।
করিয়া উত্তম খাট চাপায় আগর কাঠ
তাতে নিআ ধর্ম্মকে শোয়ায়॥
আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
আনল ভেজায় তিন ভাই।
মন্ত্র পঢ়ে ব্রহ্মাহর অগ্নি দিল মহেশ্বর
পুড়িয়া হইল ছাই॥
করিয়া অগ্নির কাজ ধোয়ায় আঙ্গার কাষ্ঠ
তিন ভাই কান্দে উচ্চ স্বরে।
করিলেন তর্পণ পিণ্ড দিল তিনজন
তপস্যাকে চলিল সাগরে॥" (জগজ্জীবন/১৩-১৪)

দাহকার্য শেষে চিতা শীতল করার পর পিণ্ডদান বিধি ছিল। অবশ্য সর্পাঘাতে মৃত্যু দাহযোগ্য ছিল না–

"সর্পাঘাত হইলে অগ্নিতে না পুড়ি।" (বিজয়/৪৩৭)

যে সমস্ত স্ত্রীরা স্বেচ্ছায় সতী হত তারা স্নান করে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করে স্বামীর চিতায় অনুপ্রবেশ করত আর পুত্ররা অগ্নিসংযোগ করত। জগজ্জীবনের কাব্যের দেবখণ্ডে ধর্মদেবের মৃত্যুর পর মনসার সতী হওয়ার বর্ণনা পাই

"স্নান করি মনসা সুন্দরী মহাসতী।
জোড় হস্ত করিয়া ধর্ম্মকে করে স্তুতি॥
চিতা প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।

চিতাত শুতিলা মনে ভাবিয়া অসার॥
চারিদিগে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।
আনলে পুড়িয়া মরে মনসা-কামিনী॥" (জগজ্জীবন/১৫-১৬)

এরপর অশৌচান্ত পর্যন্ত নানা আচার পালিত হত। অশৌচান্তে মৃতের আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও পিণ্ডদান করা হত। অর্থবান ব্যক্তিরা তীর্থে গিয়ে পিতৃতর্পণ করত। মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে জল দানই তর্পণ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠান-– নানা আচার ও ব্যয়বহুল বিধানের মধ্যে দিয়ে পালিত হত। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকে অন্ন দান, বস্ত্র দান, ভূমি দান, গো দান, কাঞ্চন দানও করা হত। সামাজিক অবস্থান অনুসারে শ্রাদ্ধের নানা বিধান। বংশীদাসের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগর পিতার মৃত্যুর পর 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ করে –

"চন্দ্রধরের মাতা পিতা মৈল কাল পায়্যা।
শতপুত্র কার্য্য করে এক পুত্র হয়্যা॥
রজত কাঞ্চন ধেনু জল ভূমি আদি।
দানসাগর শ্রাদ্ধ কৈল বৃষোৎসর্গ বিধি॥" (বংশীদাস/৬৮)

তাছাড়া কোন ব্যক্তি নিখোঁজ হয়ে গেলে বা বিদেশে মৃত্যু হলে 'তেরাত্রি' শ্রাদ্ধ করা হত। চাঁদ সদাগরের মৃত্যুর খবর পেলে সোমাই পণ্ডিত সেই ব্যবস্থা করার আদেশ দেয় —

"সোমাই পণ্ডিতে বলে স্থির কর মন।
তেরাত্রি শ্রাদ্ধ হবে বেবস্থার বচন॥" (বিজয়/৩১১)

বাঙালী সমাজে বিভিন্ন রকম পূজা-পার্বণ ও উৎসব পালিত হত; যেমন ফসল রোপণ উৎসব; অকুমারী ভূমিতে লাঙ্গল দেওয়া নিষিদ্ধ, তাই ভূমিপূজার ব্যবস্থা করা হত। জগজ্জীবনের কাব্যে শিবঠাকুরের চাষবাসের পূর্বে এই আচার পালিত হয়েছে—

"সোনার লাঙ্গলে হাল জুড়ে পশুপতি।
রহিয়া ডাক পাড়ে কুমারী বসুমতী॥
ধর্ম্মের দোহাই লাগে ধর্ম্মের মাথা খাঅ।
অকুমারী বসুমতীতে লাঙ্গল না লাগাঅ।
... ...
সোবর্ণের ঘটবারি স্থাপিলেন আগে।
বসিলেন ইন্দ্র বসুমতী বাম ভাগে॥
মাথাত ছিটায় আগে পল্লবের জল।
সুরনারীগণে করে উর্ল্লুর্ল্লু মঙ্গল॥
দুইজনার কাপড়ে বান্ধিল লগ্ন-জাটি।
ইন্দু বসুমতী করে ফুল ছিটাছিটি॥" (জগজ্জীবন/২২)

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌকার ব্যবহার ছিল প্রচুর, তাই নৌকাপূজাও করা হত। চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে নারীরা ধান, দূর্বা, পূর্ণঘট সাজিয়ে উলুধ্বনি ও বাদ্যসহকারে নৌকায় হরগৌরী পূজা করে। বংশীদাসের বর্ণনানুযায়ী—

"হস্তে ধান্য দুর্ব্বা নারী, পূর্ণ কুম্ভ সারি সারি,
বেদ পঠে সকল ব্রাহ্মণ॥
যাত্রা করি অধিকারী, পূজিলেন হরগৌরী,
প্রণাম করিলা সপ্তবার।

সুত মাগধ ভাটে , বন্দিয়া যে স্তুতি পঠে,
নারীগণ দিলেক জোকার॥" (বংশীদাস/১১২)

জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু নিয়ন্ত্রিত মানব জীবনে ছন্দোবদ্ধ আচার-বিচারে আবর্তিত মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজের রূপরেখা পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে।

ভাব-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসি ভাব-কেন্দ্রিক উপকরণগুলি অর্থাৎ শিক্ষা-সংস্কৃতির কথায়। প্রথমে আসি শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্যে। বাঙালীর প্রচলিত শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে খুব একটা পাওয়া যায় না। মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে বেশীর ভাগ মানুষই ছিল অশিক্ষিত, সাধারণ জনসমাজে শিক্ষা তেমন প্রভাব ফেলেনি, আর সেকালের শিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা হল চণ্ডীমণ্ডপের শিক্ষা। ধনী ব্যক্তিদের চণ্ডীমণ্ডপের আটচালায় পাঠশালা বসত, কখনো কখনো গুরু মহাশয়রা চতুষ্পাঠী নির্মাণ করে শিক্ষা দিত। অবশ্য তা ছিল প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্তই, উচ্চশিক্ষার সুযোগ তেমন ছিল না, মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে সম্পর্কিত তথ্যও তেমন পাওয়া যায় না। মনসামঙ্গলের চাঁদ সদাগরের ছয় পুত্র ও লখীন্দরের শিক্ষার কথা পাওয়া যায়। এর মধ্যে দিয়ে চৈতন্য-পূর্ব যুগের শিক্ষার কথা, শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষা সম্পর্কে মানুষের আগ্রহের কথা জানা যায়। সাধারণত পাঁচ-ছয় বছর বয়সে শিক্ষার্থীকে পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের হাতে অর্পণ করা হত। 'হাতেখড়ি' নামক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুর বিদ্যারম্ভ হত। অনেক সময়ই ধনী ঘরের ছেলেরা অধিক বয়সে লেখাপড়া শিখত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে লখীন্দরের পাঁচ বছর বয়সে 'হাতেখড়ি' দেওয়ার কথা পাই —

"পঞ্চ বৎসরের যদি লখিন্দর হইল।
হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল॥" (বিজয়/৩০৩)

বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের শিক্ষা বর্ণনায় সেকালের পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে জানা যায় –

"উচ্চারণ মাত্রা শিক্ষা করে গুরু-স্থানে
পড়িবারে যত্ন করে জননীর স্থানে।
লখাইর অনুমতি পায়্যা রাজরানি
সোমাই পণ্ডিত দ্বিজে ডাক দিয়া আনি।
সনকা বলেন দ্বিজ না করিহ হেলা
যত্নে পড়াইহ মোর লখিন্দর বালা।
শুনিয়া হরিষ দ্বিজ রানির বচনে
লখাইর হাতে খড়ি দিল শুভক্ষণে।
ক খ গ ঘ ঙ পড়ে হরিষ অন্তরে
চৌত্রিশ অক্ষর পড়ে বালা লখিন্দরে।
অষ্টদশ ফলা পড়ে হরিষত-মন
চৌত্রিশ অক্ষরে ফলা করিল পঠন।
অষ্ট ধাতু অষ্ট শব্দ পড়িল সত্বরে
... ...
প্রথমে পড়ায় সূত্র সুখে দ্বিজবর।
তার পর ব্যাকরণ পড়ে রাজসুতে
ভট্টি রঘু সাহিত্য পড়িল হরষিতে।
অলঙ্কার কুমার পড়িল অভিধান

জ্যোতিষ নাটক কাব্য পড়িল বিধান।
অষ্টদশ পুরাণ পড়িয়া অনিবার
হইল পণ্ডিত বড়ো রাজার কুমার।" (বিপ্রদাস/১৫৩)

আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বাইশা' বা 'বাইশ কবির মনসামঙ্গলে' বিজয় গুপ্তের কাব্যাংশে সেকালের শিক্ষা সম্পর্কিত তথ্য পাই সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালার বিবরণে। সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালায় নানা দেশ অর্থাৎ নানা গ্রাম থেকে উৎসাহী ছাত্রেরা পাঠগ্রহণ করতে আসত। অবশ্য সেই পাঠশালা চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত। কবির বর্ণনানুযায়ী –

"ছোট জন নহে চান্দ রাজভোগে ভোলা।
লক্ষ লক্ষ লোক যার আছে পাঠশালা॥
নানা দেশে পাঠ সব, নানা দেশে ঘর।
সোমাই পণ্ডিত পাঠ পড়ায় নিরন্তর॥" (বাইশা/১১৪)

সেকালের পাঠ্যবিষয় সম্পর্কেও তথ্য পাওয়া যায় সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালার বিবরণে। সেখানে "কেহ কাব্যশাস্ত্র পড়ে কেহ ব্যাকরণ।" (বাইশা/১১৪) অর্থাৎ কাব্যশাস্ত্র, ব্যাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে পাঠদান করা হত। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখীন্দরের গুরুগৃহে পাঠগ্রহণের কথা আছে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর কবি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের শিক্ষার কথা পাই।

সেকালের পাঠশালার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কের কথা পাওয়া যায় সোমাই পণ্ডিতের পাঠশালার বিবরণে। সেকালে শিক্ষককে 'গুরু মশায়' বলা হত। ছাত্ররা গুরু মহাশয়কে ভয়ও করত আবার ভক্তিও করত। গুরু মহাশয়রা ছাত্রদের নিয়মিত খোঁজখবর রাখত। তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনত —

"একদিন ছয় ভাই পড়ে পাঠশালা।
পড়িতে পড়িতে হইল দুপ্রহর বেলা॥
ক্ষুধায় বিকল সোমাই অধিক বাড়ে আশা।
শিষ্যে শিষ্যে পরিহাসে হইল জিজ্ঞাসা॥
'এখন হইল সময় ভুঞ্জিবার তরে।
কোন জনে কেমনে ভুঞ্জিবা গেলে ঘরে'॥" (বাইশা/১১৫)

অভাব-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মানুষের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ছিল। প্রথাগত শিক্ষাপদ্ধতি ছাড়া কারিগরী শিক্ষা বা চিকিৎসাবিদ্যার ব্যবস্থা সে যুগে ছিল না। একমাত্র উচ্চশিক্ষার বিষয়ে প্রতিটি ছাত্র চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষালাভ করত। সমাজে পেশাদারী চিকিৎসক বৈদ্যরা ছিল,তারা চিকিৎসাবিদ্যায় অভিজ্ঞ ছিল। চিকিৎসক হিসাবে ওঝা, বৈদ্যরা সাধারণভাবে চিকিৎসা করত, সাধারণ মানুষ চিকিৎসা বিষয়ে তাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। সর্পসঙ্কুল বাংলাদেশে প্রতি বছর সর্পদংশনে প্রচুর লোকের মৃত্যু হত, একারণে সাপের বিষের চিকিৎসা করার জন্য এক শ্রেণীর চিকিৎসক ছিল, তাদের 'ওঝা' বা 'ধন্বন্তরি' বলা হত। মনসামঙ্গল কাব্যে ধন্বন্তরী সঙ্কর গাড়রী- কথা পাওয়া যায়। এক দল শিষ্য তার কাছে 'ধন্বন্তরিবিদ্যা' শিক্ষা করেছে। অবশ্য এ বিষয়ে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করতে হত। নারায়ণ দেবের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে দেখা যায় কাশীরাজ মহিষী নানা বিদ্যা শিক্ষার জন্য রাজপুত্রকে গুরুর হাতে দেয় এবং নানা বিদ্যা অর্জনের শেষে রাজপুত্রকে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা দেয় –

"নানাবিধ বিদ্যা শিখি হৈলা বিশারদ।
শিখাইয়া দিলা গুরু বিবিধ ঔষধ॥
শঙ্খ ধন্বন্তরি গুরু দিল তার নাম।

ভূবন বিখ্যাত হল তার গুরু গ্রাম॥"[২৬]

চিকিৎসা শাস্ত্রে রাজপুত্র দক্ষতা অর্জন করে। সেকালে হেকিমি, কবিরাজী, ওঝাবিদ্যা, তুক্‌তাকের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ছিল। তাই অর্জিত বিদ্যা সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে —

"ত্রিভূবন বশীভূত ঔষধের গুণে।
ভাষায় পৌরুষ তার বাখানি কেমনে॥
বৃদ্ধ হইলেক যুবা ঔষধের বলে।
অকালে মরিলে জীবন জিয়ায় সেকালে॥
বন্ধ্যা নারীগণ হয় গর্ভের সম্ভবা।
নীরোগ সকল লোক বৃদ্ধ হয় যুবা।
অন্ধ খোঁড়া গোঁজা মেজা নাহিক সংসারে।
বৃক্ষাদিতে ফলপুষ্প বিলক্ষণ ধরে॥"[২৭]

বিভিন্ন ঔষধগুণযুক্ত লতাপাতা দ্বারা চিকিৎসা করা হত। 'বিশল্যকরণী' এমনই একটি বৃক্ষ, যার বিষনাশক ক্ষমতা আছে। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে বিশল্যকরণী বৃক্ষের বিষনাশক ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে —

"ওঝা বোলে শুন মোর যত শিষ্যগণ।
এই দুই প্রহর বহি আমার মরণ॥
শালি বিশালি গাছ সাতালি পর্ব্বতে
ঔষধ আনিয়া বাপু দেহ মোর হাতে॥
শিষ্য বোলে গুরু ঔষধ নাহি জানি।
কেমত উপায়ে যাঞা মহা-ঔষধ আনি॥
ওঝা বোলে কুকুড়াক খুয়াঅ গরল।
পর্ব্বতে নিয়া ফির প্রতি গাছের তল॥
যেই গাছের গন্ধে কুকুড়া পায় প্রাণ।
সেই গাছ আন বাপু মোর বিদ্যমান॥
ওঝার বচনে চলে এক শত শিষ্য।
কুকুড়া পক্ষক মারে খুআইঞা বিষ॥
সাতালি পর্ব্বতখান উদ্দেশিয়া যায়।
প্রতি গাছে গাছে মরা কুকুড়া ছোয়ায়॥
কুকুড়া পাইল প্রাণ ঔষধের গন্ধে।
সেই গাছ তোলে শিষ্য পরম আনন্দে॥" (জগজ্জীবন/২৫১)

রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। সর্পদংশন ব্যতীত, সংজ্ঞাহীন রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনা ইত্যাদিতে চড়চাপড় মেরে বিষ নামানোর কথা মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়। লখীন্দরের সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনার জন্য মনসা তার পিঠে চড় মারে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুযায়ী —

"নাগবাচা বিদ্যা দেবি পড়িল আপনি
ঝাটো আসিলেন বিষ কালী নাগিনী।
মন্ত্র পড়ি চাপড় মারিল তার পিঠে
ত্রস্ত হইয়া লখিন্দর আস্তে বেস্তে উঠে।" (বিপ্রদাস/২২১)

এই বিদ্যাকে মনসামঙ্গলে 'নাগবাচা' বিদ্যা বলা হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা নানা তন্ত্র-মন্ত্র তুক্‌তাক্ ইত্যাদি শিখত। বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের তন্ত্র-মন্ত্র শিক্ষার কথা পাওয়া যায় —

"হেনমতে ফিরে সুখে রাজার নন্দন
নানা তন্ত্র-মন্ত্র শিখে ভার-সম্ভারণ।" (ঐ / ১৫৩)

নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল না; বলা যায়, চৈতন্য-পূর্ব যুগের কাব্যে নারীশিক্ষার কথা নেই। সাধারণত নারীরা ছিল নিরক্ষর। চৈতন্য-পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে অবশ্য নারীশিক্ষার কথা পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে সনকাকে নির্দেশ দেয় —

"যদি গর্ভে হয় কন্যা : করিহ কুলের ধন্যা : পুত্র হৈলে পড়াইঅ তারে॥"(ক্ষেমানন্দ/২২৩)

অর্থাৎ মানুষ নারীর শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করত না। যাই হোক, পুথিগত শিক্ষা ছাড়াও নারীরা চিত্র শিল্প, সূচীশিল্প বিভিন্ন ধরনের কারুশিল্প ও রন্ধনকার্যে পারদর্শিতার পরিচয় দিত। গৃহগত পরিবেশের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠা রমণীদের কাছে তারা এই সমস্ত বিদ্যা অর্জন করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে কাজলা মালিনীর শোলার শিল্পকর্মে দক্ষতার পরিচয় আছে। তাছাড়া গৃহসজ্জা, আলপনা অঙ্কন, নৃত্যগীতে বাঙালী নারীর দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলার বাল্যকাল থেকে নৃত্যগীত শিক্ষার কথা পাই —

"মা-বাপের বাড়ীতে বেহুলা নাচে গায়।
বেহুলার নাচনে অমলা মোহ যায়॥
শিশুকাল হৈতে কন্যা শিখে নৃত্যগীত।" (ক্ষেমানন্দ/২৩৯)

প্রতিটি মনসামঙ্গলে বেহুলার নৃত্যগীত পরিবেশনের কথা আছে। আমরা বিপ্রদাসের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি —

"আপনি মৃদঙ্গ বাহে গীত গাহে রঙ্গে
সুতাল সুচ্ছন্দে নৃত্য করে অঙ্গভঙ্গে।
ক্ষেণেকে রহিয়া রামা করয়ে বিশ্রাম
পুনঃ ছন্দ-বিছন্দে নাচয়ে অনুপাম।" (বিপ্রদাস/২১৬)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও বেহুলার দেবতা প্রশংসিত নৃত্য বর্ণনা আছে —

"দেবতা-সভায় গিয়া : খোল করতাল লয়্যা : নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি : ফিরে যেন নৃত্যশিখী : গায় যেন কুকিলের ধ্বনি॥
... ...
নৃত্যগীতে মন মোহে : যতেক দেবতা কহে : ভাল নাচে বেহুলা নাচনী॥"(ক্ষেমানন্দ/২৭৩-২৭৪)

শিক্ষা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প-সংস্কৃতির সামান্য পরিচয় আছে মনসামঙ্গল কাব্যে। কাব্য, নাটক, গীত-বাদ্যের চর্চা সংস্কৃতির বিষয়। বিভিন্ন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলপনা অঙ্কন করা, মণ্ডপ সজ্জা করা হত। বেহুলার বিবাহকালে সুন্দর করে আলপনা অঙ্কন করে, ঘট ও আম্রপল্লব দিয়ে ছায়ামণ্ডপ সাজানো হয়েছিল। বরণডালা সজ্জা, ধান, দূর্বা, প্রদীপ সজ্জা, মাঙ্গলিকদ্রব্য সজ্জা, বিবাহাচার পালন ইত্যাদিতে রুচির পরিচয় আছে। অলঙ্কার শিল্পে বাঙালী শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় পাই, রূপচর্চা, কেশ বিন্যাস ইত্যাদিতে বাঙালী নারীর দক্ষতার পরিচয় পাই।

বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানঃ অতঃপর আসা যাক্ বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। বাক্-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির মধ্যে প্রবাদ-প্রবচন ও ধাঁধাঁ বা প্রহেলিকা প্রধান। মনসামঙ্গল কাব্যে প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার প্রচুর হলেও ধাঁধাঁ বা প্রহেলিকা জিজ্ঞাসার উল্লেখ দেখা যায় না। তবে বিভিন্ন ধরনের সুপ্রচুর প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহার আছে মনসামঙ্গলে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রবাদগুলির ঐতিহাসিক মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। মনসামঙ্গলে বিভিন্ন কবির ব্যবহৃত প্রবাদ-প্রবচনগুলির একটি তালিকা তৈরী করা যেতে পারে ঃ

বিজয় গুপ্তের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ –

১। দৈবের নির্ব্বন্ধ খণ্ডন কভু না যায়।

২। বিধির নির্বন্ধ কভু না যায় খণ্ডন।

৩। স্ত্রীরে যে আপন বলে সে জন বর্বর।

৪। উর্দ্ধ আঙ্গুলে কভু বাহির না হয় ঘি।

৫। স্বামী না থাকিলে নারীর জীবন কুৎসিৎ।

৬। বিনে শুদ্ধিতে ঘরে গেলে লোকে না বলে ভাল।

৭। পাকনা জামিরে যেন উপাধিক রস।

বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ –

১। জ্বর-পিত্ত মুখে যেন চিনি লাগে তিতো।

২। অতি লোভে ভাল নহে দেখ ত্রিভূবনে।

৩। ইষ্টমিত্র জত দেখ সম্পদ-সময়
পড়িলে আপদকাল কেহ কারো নয়।

৪। আপদে বনিতা বিনা নাহিক সহায়।

নারায়ণ দেবের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ –

১। বালকের মুখে জেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেতে জেন দেখি পাকা বেল॥

২। আপদ করিলে দেখ বল বুদ্ধি ছাড়ে।

৩। আপনে বর্ত্তীলাম আমার রৈল সব সংসার।

৪। মৎস হইয়া কুম্ভিরের সনে কর বাদ।

৫। যে যে গুণি সুজন হয় তার সমান ব্যবহার।
কোনকালে দূষ্য বাক্য মুখে না আইসে তার॥

৬। দুরবুদ্ধি হইলা সাধু পাতিলে জঞ্জাল।
কাকের বাসাতে কুকিল থাকে কত কাল॥

৭। চোরে ভাণ্ডার পাইলে জেন সাত হাতে লোটে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ –

১। ভাঙ্গিলে সোনার পাত্র:পুনু গড়া যায় মাত্র:ভাঙ্গিলে না গড়া যায় মন।

২। ইচ্ছা-অনিচ্ছায় যেবা অগ্নি করে হাথে।
বিদ্যমানে দেখ হস্ত পোড়া যায় তাথে॥

৩। বাঙন হইয়া চাহ ধরিতে আকাশ।

৪। কালসর্প ধরে যেবা হয়্যা মন্ত্রহীন।
দেবতা তাহারে বৈরী তার দিন ক্ষীণ॥

৫। কাটিলে বৃক্ষের ডাল মুল যদি রয়।
মঞ্জরিতে পুণরপি বহুদিন হয়॥

৬। যেই যারে হয় মিত সেই তারে করে হিত

ইতিহাসে কর অবধান।

৭। বিপত্তোর তার কেহ নহে সখা।

৮। জ্ঞান হত পুরুষের: কোন কার্য্য জীবনের: নয়ন থাকিতে সেই অন্ধ

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। পড়িল সাগরে মোর আঁচলের সোনা।

২। উত্তম হইয়া তুমি হইবে অধম।

৩। যদি কোড়ি দিতে পারি সাজি আসে পরনারী
জাতিকুল না করে বিচার।
যার নাই কোড়িধন প্রিয় নহে পুত্রগণ
নিজ নারী না দেন শৃঙ্গার॥

৪। কোড়ি হৈলে হয় মহাজ্ঞান।

৫। সতত ঘসিলে নাকি অঙ্গার ছাড়ে মৈল।

৬। বৃদ্ধা বলে প্রাণ হৈতে জাতি নাহি বড়।

বিষ্ণু পালের কাব্যে ব্যবহৃত প্রবাদ —

১। পতিব্রতা ঝি হয় গৌসিংহে সরিষা রয়
ক্রোধ না রয় ততক্ষণ।

২। বাঁউন হইয়া হাথ বাড়াইলি চাঁদে।

৩। জলে বাস করে বাদ কুম্ভীরের সনে হৈল।

৪। হাঁড়ির উমানে কুমারে গড়ে সরা।

এ সমস্ত প্রবাদ-প্রবচনগুলির মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ধ্যান- ধারণার প্রকাশ আছে। কখনো মানব চরিত্র সম্পর্কে, কখনো বা নারীর অবস্থা সম্পর্কে, কখনো সামাজিক বিভিন্ন অনুষঙ্গ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। হেঁয়ালি বা ধাঁধাঁ ব্যবহার বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়, বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠান, বাসরযাপন ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হলেও মনসামঙ্গলে ধাঁধাঁর ব্যবহার নেই। কবিগণ কাল-নির্ণায়ক প্রহেলিকা দিয়েছেন, তা থেকে কবিদের সময়কাল সম্পর্কে জানা যায়।

ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদান ঃ অতঃপর আসা যাক্ ক্রীড়া ও শরীরচর্চা-কেন্দ্রিক উপাদানগুলির কথায়। মনসামঙ্গল কাব্যে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চার কথা বর্ণিত হয়নি, আসলে গ্রামীণ বাঙালী সমাজে স্বাস্থ্য ও শরীরচর্চা খুব একটা হত বলে মনে হয় না, তবে সমাজে বিভিন্ন ধরনের লোকক্রীড়া প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে বাঙালী বালক-বালিকারা বাল্যকালে যে সমস্ত ক্রীড়া, খেলাধূলা ও দৌড় ঝাঁপ করত তাতেই তাদের শরীর ও মন বিকশিত হত। বিপ্রদাসের কাব্যে লখীন্দরের বাল্যক্রীড়ায় রাজাপাত্র, তেঁপাতিয়া, বাঘচালি, মঙ্গলপাঠান, সতরঞ্চ, চৌপার ইত্যাদি লোকক্রীড়ার কথা আছে। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে —

"প্রথমে খেলায় ভাড় পুরিয়া ধুলায়
হুকাহুকি করে কেহ অঙ্গুলি মট্কায়।
অঙ্গরি লইয়া সুখে রাজা-পাত্র খেলে
জেই হারে তারে মারে শিশুগণ মেলে।
তেপাঁতিয়া বাঘচালি মঙ্গল-পাঠান
কেহ হারে কেহ জীনে নহে সমাধান।

সতরঞ্চ চৌপাড় খেলায় শিশুসঙ্গে
দম্ভ করি আঠারো সতেরো ডাকে রঙ্গে।" (বিপ্রদাস/১৫৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে 'ভাঁটা', 'টিকডাঁড়ি' খেলার কথা পাই। কাজলা মালিনীর দুই পুত্র সমস্ত দিন ভাঁটা খেলে বেড়ায়। রাখাল বালকদের খেলার বর্ণনায় কবি লিখেছেন—

"কেহ টিকডাঁড়ি খেলে কেহ ভাঁটাকড়ি।" (ক্ষেমানন্দ/৮৮)

এছাড়া পাশা, সতরঞ্চ বা দাবা ইত্যাদি খেলার বিশেষ প্রচলন ছিল।

সামাজিক অবস্থা ঃ মনসামঙ্গল কাব্যে তিন বঙ্গের তিনটি ধারায় বাঙালী সমাজের যে রূপ পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসের একটি সামগ্রিক রূপ পাওয়া যায়। শুধু আচার-বিচার, সংস্কার-বিশ্বাস, খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদই নয়, সমাজের আভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কেও জানা যায়। লক্ষণীয়, সমাজ চরিত্রের দিক থেকে তিন বঙ্গের সমাজ ইতিহাসের খুব একটা পার্থক্য নেই। অখণ্ড বাংলাদেশের চরিত্র একই ভাবে গড়ে উঠেছে, তবে কালগত ব্যবধানে এবং অঞ্চলগত ব্যবধানে সামান্য পার্থক্য ঘটে থাকবে।

মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজ ছিল পুরুষশাসিত। মধ্যযুগীয় পুরুষরা ছিল স্বেচ্ছাচারী, শিথিল চরিত্রের। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে তাই পুরুষকে 'ভ্রমরা জাতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্যশাসিত কুলীন সমাজের মধ্যমণি শিবঠাকুর স্বয়ং সমাজ নিয়ন্ত্রণ করত। আবার সে-ই কামপরবশত পরনারী আসক্ত হয়ে পড়ে সামাজিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করত। সমাজে পুরুষ চরিত্র কত দুর্বল ছিল তার দৃষ্টান্ত শিবঠাকুর, কেননা নারী দর্শনেই সে কামাসক্ত হয়। পুরুষের এই নৈতিক দুর্বলতা সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল। পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থায় নারীর ক্ষমতা খুব সীমিত, কিন্তু ভ্রষ্ট চরিত্র পুরুষকেনিয়ন্ত্রণ করতে হত নারীকেই। মনসামঙ্গলে দেখি পার্বতী শিবঠাকুরের আঁচলে আঁচল বেঁধে শুয়েছে। কিন্তু ভ্রমর বৃত্তির পুরুষকে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ ছিল না। পার্বতীর ডোমনী বেশ ধারণের মধ্যে দিয়ে শিবঠাকুরকে নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাই লক্ষ করা যায়। মনসামঙ্গলে পার্বতীর ডোমনী বেশ ধারণ এবং মনসার বার বার ছদ্মবেশ ধারণের কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে— প্রথমতঃ পুরুষের ভণ্ডামীর স্বরূপ প্রকাশ করে লজ্জিত করে তাকে সংশোধনের প্রচেষ্টা। দ্বিতীয়তঃ সেকালে উচ্চবর্ণের নারী ছিল সম্পূর্ণ পর্দানসীন, গৃহের বাইরে তাদের গতিবিধি ছিল না, তাই ডোমনী বেশ ধারণ করে তাকে বাইরে যেতে হয়েছে। মনসা মালিনী, গোয়ালিনী, কিম্বা বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করেছে কারণ নিম্নবর্ণের নারী এবং উচ্চবর্ণের বিধবা ব্রাহ্মণীর গতিবিধি অনেক অবাধ ছিল। তৃতীয়তঃ উচ্চবর্ণের সমাজে নারীকে কখনো কখনো হীন বৃত্তিতে নেমে যেতে হয়েছে। পুরুষ ইন্দ্রিয়াসক্তি ও অকর্মণ্যতা নিয়ে মগ্ন থাকত আর নারীকে অনেক সময় গৃহের ব্যয়ভার বহন করতে হত। বস্তুতঃ দেবদেবীর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও হরগৌরীর সংসারযাত্রার বিবরণে তাই মনে হয়।

শিথিল চরিত্র পুরুষের পরনারী আসক্তিবশত যে সন্তানের জন্ম হত তাকে সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হতে হত। মনসার জন্মবৃত্তান্ত থেকে তাই মনে হয়। পিতা সেই পরিত্যক্ত কন্যাকে চেনে না এটাই স্বাভাবিক। বিজয় গুপ্ত লিখেছেন — "পুষ্পবনে জন্মিল কন্যা বাপে নাহি জানে।" (বিজয়/২০)। বলাই বাহুল্য কুলীন পুরুষের অবৈধ সন্তান মনসা। বৃদ্ধ শিবঠাকুর যুবতী কন্যা মনসাকে দেখে কামপরবশত আলিঙ্গন প্রার্থনা করে, কিংবা খেয়া পারের যুবতী ডোমনীকে দেখে আলিঙ্গন কামনা করে, এসমস্ত ঘটনা থেকে সমাজে নৈতিকতার বাঁধন কত আল্‌গা ছিল তা বোঝা যায়। অবৈধ সন্তান জন্মদানের পর তাকে পরিত্যাগ করার ঘটনা সমাজে নতুন নয়, মনসাও সে-কারণে পরিত্যক্তা। মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যশাসিত সমাজ এসব অবৈধ সন্তানদের আশ্রয় দিত না, ঘৃণার চোখে দেখত। মনসারও সমাজে ঠাঁই হয়নি, তাকে বনবাসে পাঠাতে হয়েছিল।

পুরুষের পাশাপাশি নারীরও নৈতিক অধঃপতন ঘটেছিল। নারীদের শিক্ষাদীক্ষা খুব একটা ছিল না, তারা তাদের ক্ষুদ্রতা নিয়ে, কলহ নিয়ে, পরনিন্দা, পরচর্চা নিয়ে দিনাতিপাত করত। নারীদের পতিনিন্দা অংশগুলিতে নারীর

এই সংকীর্ণ মনের ছাপ স্পষ্ট। বিপ্রদাসের কাব্যে নারীর পতিনিন্দায় বলা হয়েছে —

"বৃদ্ধ ভাবিনী জত লখাই দেখিয়া হত
মৃতাবত যৌবনের শোকে
জখন যৌবন ছিলো হেন বর না মিলিল
সর্ব্বক্ষণ বঞ্চিতু কৌতুকে।
জতো বালা অবস্থিতা সেই ভাবে মন-কথা
যৌবন প্রকাশ মাত্র তায়
লখাইর রূপগুণে সেহ হত কামবাণে
দ্বিজ বিপ্রদাস রস গায়।" (বিপ্রদাস/১৯০)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই অধঃপতন আরো কতটা প্রকটিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে। এখানে দেখা যায় গঙ্গা ও দুর্গা যুক্তি করে গৃহত্যাগ করেছে। নদী পারাপারের সময় দুর্গার রূপ দেখে ব্রহ্মা কামাসক্ত হয়েছে, শেষে দুর্গা গর্ভবতী হয় এবং শেষে নদীতীরে গর্ভপাত করে। কিংবা লখীন্দরের মাতুলানীর শ্লীলতাহানির প্রসঙ্গ সামাজিক সুস্থতার লক্ষণ নয়। এমন কি পুরুষ কখনো কামপরবশত আপন কন্যার প্রতি আসক্তি প্রকাশ করত। জগজ্জীবনের কাব্যে দেবখণ্ডে পাই —

"কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।
উপার্জ্জিয়া খাল্যে ফল দোষ কিবা আছে॥
বাপের বচনে কথা কহে তিন ভাই।
উপার্জ্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই॥
গোসাঞি বোলে তিন পুত্র শুন মোর বাণী।
ভগ্নী এক সৃজিল তোমার মনসা-কামিনী॥
তার রূপ দেখি মোর স্থির নাই মন।
বিভা করাইয়া দেহ পুত্র তিন জন॥" (জগজ্জীবন/৯)

নিম্নবর্ণের সমাজেও নারীর এই অধঃপতন দেখা গিয়েছিল। বাধ্য হয়ে সামাজিক বিধান মেনে নিলেও সুযোগ পেলেই তারা বিধান লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছাচারীতার পরিচয় দিত। যুবতী ও বিধবারা যে কোন পুরুষের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারত। জগজ্জীবনের কাব্যে এক যুবতী বিধবার বক্তব্য —

"ঘরমধ্যে যুক্তি করে যুবক সব রাড়ি॥
যুবক রাড়ি বোলে আমার কিবা ডর।
নিভাতারী ভাতার পাব চণ্ডিকার বর॥
যে পাইকে লৈয়া যাবে তার সঙ্গে যাব।
রান্ধিয়া রাঢ়িয়া ভাত সুখে বসি খাব॥"(ঐ/১৮৩)

এ সমস্ত কারণেই নারী-পুরুষের সুস্থ সম্পর্কের জায়গায় ফাটল ধরেছিল। প্রতিটি মনসামঙ্গল কাব্যেই দেখি যে, শিবঠাকুর মনসাকে গৃহে নিয়ে এলে পার্বতী তাকে সতীন বলে সন্দেহ করে। মনসা পার্বতীর কাছে নিজের পরিচয় দিলেও তা বিশ্বাস করা সম্ভব হয়নি —

"না বোল সতীন মোকে না করিহ পাপ।
শিব মোর স্বামী নহে জন্মদাতা বাপ॥

দুর্গা বোলে মালঞ্চে করিলে নানা কেলি।
সঙ্কট দেখিয়া স্বামীকে বাপ বোল বালি॥" (ঐ/৮৪)

জগজ্জীবনের কাব্যে 'কলির ফলাফল' সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে নারীর এই অধঃপতনের কথা-

"স্ত্রীলোক ছাড়িবে তবে আপনার পতি।
পরের পুরুষ লইয়া ভুঞ্জিবে সুরতি॥" (ঐ/৬)

নৈতিক অধঃপতনের কারণেই নরনারীর পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। একারণেই নারীকে 'গর্ভপত্র' নিতে হত, চাঁদের বাণিজ্য যাত্রাকালে সনকা চাঁদের নিকট থেকে গর্ভপ্রমাণ স্বরূপ 'গর্ভপত্র' নিয়েছিল। সনকা চাঁদকে বলে –

"পঞ্চ মাস গর্ভ মোর কেহ নাহি জানে।
লোকধর্ম্মাচারে পাছে হয় অপমান
তবে পত্র দেহ রাজা সভা বিদ্যমান।" (বিপ্রদাস/১৪০)

এ কারণেই পুত্র লখীন্দরকে প্রথম বার আপন গৃহে দেখে সনকাকে চাঁদ প্রশ্ন করে — "পর পুরুষ দেখি কেন পুরীর ভিতর।"(বিজয়/৩১৭)। নারী-পুরুষের সম্পর্ক কতখানি অসুস্থ ছিল অন্যান্য বিবরণেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাচারী স্বামীর দৃষ্টিতে নারী ছিল ভোগের উপকরণ, পুত্র উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র, তাই স্বামী ইচ্ছে করলেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারত। জরৎকারু বিবাহ রাত্রেই সামান্য অপরাধে মনসাকে পরিত্যাগ করে, কিন্তু নিজ বংশ রক্ষার জন্য পুত্র বর দিয়ে যায়। পুরুষের কাছে নারীর কোন মর্যাদা ছিল না, তাই চাঁদ সদাগর বার বার সনকাকে উপেক্ষা করে গেছে, তাই শান্তনু এক রাত্রি পরগৃহ বাসের জন্য স্ত্রী গঙ্গাকে পরিত্যাগ করে। লখীন্দর পুরুষ বলেই মায়ের নিষেধ অমান্য করে বিবাহে রাজী হয়। এমন কি স্ত্রীর কাছে গুপ্ত কথা প্রকাশ করাও নিষেধ ছিল—

"রাজস্থানে পুরাণে শুনিল জথা তথা
কদাচিত না কহিব স্ত্রীরে মর্মকথা।" (বিপ্রদাস/ ১০৭)

পুরুষের দৃষ্টিতে নারী যে ভোগের উপকরণ মাত্র ছিল মঙ্গলকাব্যে পুরুষ চরিত্রগুলির আচরণে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। শিবঠাকুর ও চাঁদ সদাগর চরিত্রেই তার প্রকাশ দেখি। শিবঠাকুর নারী দর্শন মাত্র কামাসক্ত হয়ে পড়ে, চাঁদ সদাগর সনকার ভগ্নীবেশী মনসাকে দেখে কামাসক্ত হয়ে পড়ে, এমন কি নিজের দুর্বাসনার কথা স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করতেও লজ্জিত হয় না। বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদ সনকাকে বলে —

"গুপ্তে সনকায় ডাকি বুঝাইয়া বলে
তব ভগ্নি দেখি অঙ্গ দহে কামানলে॥
তারে বুঝাইয়া প্রাণ রাখহ আমার
কর্ণে হস্ত দিয়া রানী করে হাহাকার॥" (ঐ/৯২)

দেবসভায় নর্তকী বেহুলাকে দেখে শিবঠাকুর বলে —

"দেখিয়া যৌবন তোর কাম-সাগরেতে মোর
ডুবি মন হইল বিকল।" (ঐ/২১৭)

শুধু পুরুষই নয়, নারীর নৈতিক আদর্শের হীনতাপ্রাপ্তি ঘটেছিল; তাই পরস্ত্রীকে নিজের স্বামীর ভোগের জন্য তুলে দেওয়ার প্রস্তাব করতেও দ্বিধাবোধ করত না। বিপ্রদাসের কাব্যে সঙ্কর গাড়রীর স্ত্রী কমলা ছদ্মবেশিনী মনসাকে বলে —

"সহেয়ার হাব্যাস যদি বাড়ে তব মনে।

রঙ্গে নিশি বঞ্চিহ আমার স্বামী সনে॥" (ঐ/১০৬)

নারীদের পতিনিন্দা সামাজিক অবস্থার ফলশ্রুতি হলেও সুস্থ সমাজ মানসিকতার বিষয় নয়। জগজ্জীবনের কাব্যে ও বংশীদাসের কাব্যে বর্ণিত লখীন্দরের বাসরঘরে নারীদের স্থূল-অশালীন আচরণ এমন কি বৃদ্ধার বিকৃত লালসা আমাদের আহত করে। নরনারী সম্পর্কের মুখ্য উপাদানই হয়ে উঠেছিল কাম। জগজ্জীবনের কাব্যে সেকালের নারী সম্পর্কে পুরুষের মনোভাব এরকম ছিল—

"পরস্ত্রীকে পাইলে পুরুষ নাকি এড়ে।
আহার পাইলে তবে ব্যাঘ্র নাকি ছাড়ে॥
ঘৃত পাইলে যেন অগ্নি উঠে জ্বলি।
কমল দেখিঞা নাকি ক্ষেমা মানে অলি॥
মণ্ডুক দেখিয়া যেন আনন্দ ভুজঙ্গ।
স্ত্রীলোক দেখিয়া যেন কামের তরঙ্গ॥" (জগজ্জীবন/২৭৪)

মনসামঙ্গলে নারী সম্পর্কিত নানা সংস্কার সেকালে নারীর অবস্থানটি স্পষ্ট করে দেয়। নারী কখনোই একরাত্রি গৃহের বাইরে বসবাস করতে পারত না, তাহলে তার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ করা হত। বিপ্রদাস ও ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখতে পাই ধর্মযজ্ঞে দেবতাদের রন্ধনের জন্য শান্তনুর স্ত্রী গঙ্গাকে শিবঠাকুর নিয়ে যেতে চাইলে শান্তনু জানিয়ে দেয় —

"আমার সহিত তবে এহ কর পণ।
গঙ্গারে লইয়া তবে করিবা গমন॥
দিবসে লইয়া যাবে, আনিবে দিবসে।
অস্তগত দিবাকর না লইব বাসে॥" (ক্ষেমানন্দ/১২)

বস্তুত শান্তনু গঙ্গাকে গ্রহণ করেনি, এমন কি নারী বাড়ির বাইরে রাত্রিবাস করলে স্বামী তার হাতে জল স্পর্শ করত না। বেহুলা লখীন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য দেবলোকে যাত্রা করলেও লখীন্দর প্রাণ ফিরে পেয়ে বেহুলার চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ করে। বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দর বেহুলাকে জানায় বেহুলার হাতে তার অন্নগ্রহণ সম্ভব নয় —

"কোথা যাও প্রিয়া তুমি শুনহ বচন।
কিমতে রন্ধন তব করিব ভোজন॥
ছয়মাস ভাসিয়া আসিছ দেবপুরে।
পরীক্ষা হইলে হস্তে পারি খাইবারে॥" (বংশীদাস/২৩৮)

গৃহের বাইরে রাত্রি বাসের কারণে বেহুলাকে নারায়ণ দেব, বংশীদাস এবং জগজ্জীবনের কাব্যে গৌরীকে পরীক্ষার দ্বারা সতীত্ব প্রমাণ করতে হয়েছে। কারণ সমাজ; চাঁদ সদাগর স্নেহবশত বেহুলাকে গ্রহণ করলেও সমাজ জ্ঞাতিবর্গকে সন্তুষ্ট করার প্রয়োজনেই চাঁদ বেহুলার সতীত্ব পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়—

"এক কথা মনে ভাবিএ কুশ্চিত॥
ছএ মাস ভাসিল বেউলা জলের উপরে।
জ্ঞাতিবর্গ সুনিয়া হাসিব আমারে॥
সাবধানে পণ্ডিত কবে আমার উর্থর।
পরিক্ষা করিয়া বধূ চলি জাউক ঘর॥" (নারায়ণ /২৮৫)

পুরুষশাসিত সমাজ কোন ভাবেই নারীর কর্তৃত্বকে স্বীকার করতে চায়নি, তাই অনুশাসনের নিগড়ে আবদ্ধ করে

রাখতে চেয়েছে। দেবীদের পূজা প্রচার আসলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। নারীও এই সংগ্রামে নারীর পক্ষ অবলম্বন করেনি। চৈতন্য-পরবর্তীকালে নারী সমাজে খানিকটা প্রতিষ্ঠা পেলেও পুরুষ সহজে স্বীকার করেনি, তবে পুরুষের মনোভাব অনেকটা পরিবর্তন হয়েছিল। তাছাড়াও আরও নানা বাঁধন ছিল। নারীকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল, যেমন পদ্মিনী, শঙ্খিনী, চিত্রাণী ও হস্তিনী ইত্যাদি। অবশ্য পুরুষকেও চার ভাগে ভাগ করা হয়েছিল, অশ্ব, শশ, বৃষ ও মৃগ। কোন জাতীয় পুরুষের সঙ্গে কোন জাতীয় নারীর বিবাহ হওয়া উচিত তা স্থির করে বিভিন্ন বাধানিষেধ আরোপিত হয়েছিল। বংশীদাসের বর্ণনানুসারে —

"হস্তিনী শঙ্খিনী আর চিত্রাণী পদ্মিনী।
অশ্ব শশ বৃষ মৃগ চারি জাতি গণি॥
যে জাতি পুরুষে শোভে সেই জাতি নারী॥
তার ভেদ কহিতে আগে শুন লো সুন্দরী॥
হস্তিনী নারীতে ইচ্ছে অশ্বক পুরুষ।
বৃষক পুরুষ পাইলে শঙ্খিনী সন্তোষ॥
মৃগ জাতি পুরুষে চিত্রাণী বাসে ভাল।
শশক পদ্মিনী সঙ্গে বঞ্চে চিরকাল॥" (বংশীদাস/১৮৩)

নারী সম্পর্কিত আরো নানা সংস্কার ছিল। নারীকে সুলক্ষণা-অলক্ষণা বিচার করা হত তার শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে, যেমন - উঁচু দাঁত, উঁচু কপাল, ফাঁকা দাঁতের গঠন যুক্ত নারী অলক্ষণা বলে বিবেচিত হত। বাসর ঘরে লখীন্দরের সর্প দংশনে মৃত্যু হলে তাই সকলেই বেহুলাকে দোষারোপ করে —

"বিষম সাধুর হটে : আমা সভে কিবা ঘটে : ভাল রীত নহে যে তাহার॥
যতেক কুলের ধনী : বেহুলার কথা শুনি : আপন শ্রবণে দেই হাথ।
চিরণ চিরণ দাঁতী : বিভার মঙ্গল রাতি : বাসরে খাইলে প্রাণনাথ॥"(ক্ষেমানন্দ/২৬১)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেও দেখি লখীন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার অলক্ষণ নির্দেশ করা হয়েছে —

"অতি কুলক্ষণী বেটি মটুক কপালী।
মারিলে সুন্দর বালা নিরাশী বিড়ালী॥
দন্ত তোর দীঘল চিরণ মাথার চুল।
কুলক্ষণী ডুবাইলে বানিয়ার কুল॥" (জগজ্জীবন/২৪৩)

সাংসারিক মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য নারীকে দোষারোপ করা হত। লখীন্দরের মৃত্যুর পর সনকা বলে—

"সোনাই বলে বেউলা তুমি লঘুচর জাতি।
বিহার রাত্রে খাইলা পতি নহে বাসি রাত্রি॥" (বিজয়/৪৩৫)

নারী নিজেও এসম্পর্কে বিশ্বাস করত, বস্তুত বিবাহের রাতে স্বামীর মৃত্যু বড়ই অমঙ্গল বলে বিবেচিত হত। লোকেও তাকে উপহাস করত —"বিহার রাত্রে স্বামী মরে লোকে উপহাস্য।" (বিজয়/৪৩৯)।

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও দেখি বেহুলা তার ভাইদের বলেছে –"বিভা রাত্রে পতি মরে বড় অকুশল।" (ক্ষেমানন্দ/২৬৪)। এমন কি বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি চাঁদের নৌকাডুবির জন্য চাঁদ সনকার অলক্ষণকে দায়ী করেছে। শুধু তাই নয় বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের কারণে নারীকেই দোষারোপ করা হত। জগজ্জীবনের কাব্যে লখীন্দর মাতুলানী কৌশল্যার শ্লীলতাহানি করলে, লখীন্দর পুরুষ হওয়ার কারণে রক্ষা পায়, কিন্তু কৌশল্যাকে দোষারোপ করে গহনা-অলঙ্কার দিয়ে ভুলিয়ে দেওয়া হয়। কবি লিখেছেন-

"কে তোকে করিল বল করিস শিশুর ছল

সবারে বুঝিতে বেড়ায় মন।
যে হৈল সে হৈল মাও চুপে চাপে ঘরে যাও
পহ্নিয়া সূবর্ণ আভরণ॥" (জগজ্জীবন/১৬৮)

কৌলীন্যশাসিত সমাজে বহুবিবাহের মত সতীদাহ ও বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। নারীগণের পতিনিন্দা অংশটি কৌলীন্য প্রথাও বাল্যবিবাহের ফলশ্রুতি বলে মনে করি। কৌলীন্য প্রথা শেষ পর্যন্ত বংশগত প্রথাতে পরিণত হয়েছিল। ফলত, কুলীন কন্যার বিবাহ কুলীন পাত্র ছাড়া সম্ভব ছিল না। কুলীন পিতা কুল রক্ষার তাগিদে বৃদ্ধ, শিশু, অন্ধ, খঞ্জ, রোগগ্রস্ত যে কোন পাত্রের হাতে কন্যা সম্প্রদান করত। তাই বালিকা মনসার বিবাহ হয় বৃদ্ধ জরুৎকারুর সঙ্গে। তাইতো এয়োগণ বেহুলার বিবাহসভায় রূপবান লখীন্দরকে দেখে স্বামী দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করেছে। যেমন —

"এক যুবতী বোলে মাও মোর কপাল পোড়া।
মুই হেন সুন্দরী রামা মোর স্বামী খোঁড়া॥
.....
আর যুবতী বোলে সখী মোর কথা শুন।
আমার কালুয়া স্বামী দুই চক্ষে ঊন॥
... ...
আর যুবতী বোলে কথা মিথ্যা নাই তোর।
আমি হেন সুন্দরী নারী স্বামী কুব্জা মোর॥
... ...
আমি হেন সুন্দরী রামা গোদা স্বামী বুড়া।
দুই পায়ে দুই গোদ যেন ধানের পুড়া॥" (ঐ/১৮৯-১৯০)

অনেক সময় কন্যার পিতা কড়ির বিনিময়ে অপাত্রে কন্যা সম্প্রদান করত –

"আমার বাপ মাও তবে দুই চক্ষ ধরে।
কড়ি খায়া দেলে মোকে সড়া পচার ঘরে॥" (ঐ/১৮৯)

কখনো বাল্যকালেই নারীর বিবাহ দেওয়া হত, তাই বিপ্রদাসের কাব্যে এক কুলীন কন্যার আক্ষেপ শুনি—

"আর আইয় ভাবে দুঃখ চাহিয়া লখাই-মুখ
শিশুকালে বিভা হইল কেনি
আমি হেন-রূপ হই বিবাহে কুরূপ পাই
চক্ষু খাইল জনকজননী।" (বিপ্রদাস/১৯০)

বস্তুত নারীকে রজঃস্বলা হবার আগেই বিবাহ দেওয়া বিধি ছিল। তাই ঘটক ব্রাহ্মণ যুবতী বেহুলাকে দেখে সায় সদাগরকে বলে —

"ব্রাহ্মণ বলেন বাণ্যা শুন তোরে কহি।
এত বড় যুগ্য কন্যা আছে অবিবাহী॥
সভার প্রধান তুমি বণিকের নাথ।
কন্যা দেখি কেমনে উদরে দেহ ভাত॥" (ক্ষেমানন্দ/২৪১)

বহুবিবাহ প্রচলিত থাকায় কুলীন পাত্রেরা একাধিক বিবাহ করত। মনসামঙ্গলের শিবঠাকুর কুলীন সমাজের সমাজপতি, তার গঙ্গা ও গৌরী নামের দুই স্ত্রী। প্রধানত কুলীন সমাজেই বহুবিবাহ বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল বোধ

হয়। নারায়ণ দেবের কাব্যে বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে পথে গোদার পরিচয় পাই, সে সত্তর বছরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তার চার স্ত্রী। সে বেহুলাকে বলে—

"তোর রূপে তেজিব ঘরের চাইর নারি।
রত্ন অলঙ্কার দিব দুই হস্ত ভরি॥" (নারায়ণ/৯৮)

বিপ্রদাসের কাব্যে বেহুলাকে জুয়ার বলেছে —

"আছয়ে তেইশ মাগু রূপে অনুপমা।
তা সবার রূপ মনে নাই লএ আমা।" (বিপ্রদাস/ ২১২)

জগজ্জীবনের কাব্যে শিবঠাকুর বেহুলাকে বলেছে —

"দুই স্ত্রী ছাড়িব পার্ব্বতী আর গঙ্গা।
তুমাকে লইয়া আমি হইব অর্দ্ধ অঙ্গা॥" (জগজ্জীবন/২৯৮)

এই অংশগুলিতে হাস্যরসের অবতারণা হলেও নির্মম সমাজ সত্যের প্রকাশ আছে। পুরুষ বহুবিবাহ করলেও সকল স্ত্রীকে নিয়ে ঘর করত না, সামান্য কারণেই স্ত্রীকে ত্যাগ করত। কখনো বংশ রক্ষার প্রয়োজনে, কখনো উপার্জনের কারণে বিবাহবৃত্তি গ্রহণ করত। নারীর বহুপতি গ্রহণের দৃষ্টান্ত না থাকলেও জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি শান্তনু পরিত্যক্ত গঙ্গাকে শিবঠাকুর গ্রহণ করেছে, হয়ত পৌরাণিক প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে এই ঘটনা মনসামঙ্গলে প্রবেশ করেছে। আবার যুবতী বিধবাদের উক্তিতে বহুপতি গ্রহণের প্রবণতা ধরা পড়েছে।

মধ্যযুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল; মনসামঙ্গলে সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক সময় সদ্যবিধবা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দিত, অনেক সময়ই সতীদাহ বলপূর্বক করা হত। প্রধানত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ কুলীন সমাজেই সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে ধীরে ধীরে নিম্নবর্ণের সমাজেও সতীদাহ প্রথা প্রবেশ করেছিল। চৈতন্য-পূর্বযুগের মনসামঙ্গলে সতীদাহের উল্লেখ কম। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি বিষ পানে শিবের মৃত্যু হলে দেবগণ পার্বতীকে সহমরণে যাবার অনুরোধ করেছে —

"শিব সঙ্গে যাও মাতা না কর অন্যথা।
তবে বশ হইয়া চলিল জগতের মাতা॥
শিব সঙ্গে শ্মশানে শুইয়া ভগবতী।
তাহা দেখি আনন্দিত দেবী পদ্মাবতী॥" (বিজয়/১০৯)

চৈতন্য-পরবর্তী যুগেই সতীদাহ প্রথা ব্যাপক আকার ধারণ করে। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভক্তিবাদ হ্রাস পেলেও যুক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পক্ষান্তরে আচার-বিচারের কঠোরতা জগদ্দল পাথরের মত সমাজের বুকে এঁটে বসেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর কবি জগজ্জীবনের কাব্যের দেবখণ্ডে মনসাকে স্বেচ্ছায় সতী হতে দেখি। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বলপূর্বক সতী হতে বাধ্য করা হত। তাই বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি পার্বতী সতী হতে গিয়ে চিতা থেকে লাফিয়ে পড়েছে নদীর জলে—

"অগ্নির তেজ দেবী সহিতে না পারে।
ঝাপ দিয়া পড়ে গিয়া জলের মাঝারে॥" (ঐ/১১০)

আবার জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি লখীন্দরের মৃত্যুর পর চাঁদ সদাগর জ্ঞাতিগণকে নির্দেশ দিয়েছেন পুত্রবধূকে নিয়ে গগড়িঞা যেতে। বেহুলা তখন স্বামীর চিতায় তাকে না পুড়িয়ে সাগরের জলে ভাসিয়ে দিতে অনুরোধ করেছে —

"না মার শ্বশুর মোকে পোড়াঞা আনলে।
ভাসাইয়া দেহ মোকে সাগরের জলে॥" (জগজ্জীবন/২৫৪)

মনসামঙ্গল কাব্য পাঠে মনে হয় মধ্যযুগীয় বাঙালী সমাজে নিম্নবর্ণের সমাজে নারীর স্বাধীনতা ও সম্মান যথেষ্ট

বেশি ছিল। নিম্নবর্ণের সমাজে পর্দাপ্রথার প্রচলন ছিল না, ফলে জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সহযোগিনী হতে পারত। ডোমনী, পাটনী, ফুলওয়ালী, পসরাওয়ালী, গোয়ালিনী জাতীয় চরিত্রগুলি দেবদেবীর ছদ্মবেশ হলেও বোঝা যায় এদের গতিবিধি সর্বত্র ছিল, আর ছিল বলেই দেবী তাদের ছদ্মবেশ ধারণ করেছে। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র বিক্রি করত। মনসামঙ্গলের শেষ পর্যায়ে বেহুলার ডোমনী বেশ ধারণ করে চাঁদ সদাগরের গৃহে গমন কিংবা যোগিনী বেশ ধারণ করে সায় বেণের বাড়ী গমন সামাজিক বাধা নিষেধের কারণেই। গৃহের বাইরে নারীর গতিবিধি নিষিদ্ধ ছিল বলেই সমাজ তাদের গ্রহণ করত না। আবার চাষী পরিবারের বচাই জননী কিংবা জালু-মালুর জননী নারী হলেও তাদের নির্দিষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। জালু-মালু মায়ের কথা ও সম্মান নষ্ট করতে পারেনি। বোধ হয় নিম্নবর্ণের সমাজ ছিল খানিকটা মাতৃতান্ত্রিক। তাই সেখানে নারীর সম্মান ছিল এবং এই সমাজে নারী দেবতার পূজাও হত। উচ্চবর্ণের সমাজে নারী অন্তঃপুরে বার-ব্রত নিয়ে মগ্ন থাকত, দাম্পত্য জীবনে তাদের সম্মান ছিল না, তাই নারী দেবতার পূজাও সম্ভব ছিল না। তাই চাঁদ সদাগর অনায়াসে সনকার বুকভাঙ্গা হাহাকারকে অস্বীকার করে গেছে। পার্বতী, গঙ্গা, সনকা, চাঁদের ছয় পুত্রবধূ, বেহুলা একই সমাজেরই প্রতিনিধি চরিত্র। এমন কি দেখা যায় স্ত্রীর মৃত্যুতে বিলাপ করাও কাপুরুষতার লক্ষণ বলে বিবেচিত হত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে পার্বতীর মৃত্যুর পর শিবঠাকুর বিলাপ করলে নারদ শিবঠাকুরকে বলে—

"স্ত্রীর জন্য বিলাপ কর নহে বাস লাজ।" (বিজয়/৫৯)

এমন কি স্ত্রী স্বামীর সহকর্মী হতে পারত না। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাওয়াও সমাজে নিন্দিত হত। জগজ্জীবনের কাব্যে দেখি পুষ্পবনে যাত্রাকালে দুর্গা শিবের সঙ্গে যেতে চাইলে শিবঠাকুর জানিয়ে দেয়-

"শিব বোলে স্ত্রী লয়া যাইব কেমনে।
শুনিয়া ভর্চ্ছিবে মোকে যত দেবগণে॥" (জগজ্জীবন/৭১)

ব্রাহ্মণ্যসমাজের বিধবা ব্রাহ্মণীরা যেমন সর্বত্র যেতে পারত, তেমনি মনে হয় অভিজাত ঘরের নারীরা অনেক সময় দাসদাসী পরিবেষ্টিত হয়ে নগরের বাজারে যেতে পারত। অবশ্য চৈতন্য-পূর্বকালের কাব্যে এই প্রসঙ্গটি নেই। জগজ্জীবনের কাব্যে মেনকা দাসীকে নিয়ে হাটে যায় —

"হাট করিতে সাজে মেনকা পেটে বান্ধি ধামা।
... ...
দাসী সঙ্গে জনা চারি হাট করিতে যায়।
যতেক নগরের নারী বসিয়া রয়া চায়॥" (ঐ/১৭)

বিষয়টি অভিনব, সুতরাং নগরের নারীরা দেখে বিস্মিত হয়। মনে হয় মোগল হারেম থেকে প্রসঙ্গটি এসেছে। বেশীর ভাগ নারী ছিল অশিক্ষিত, তাদের মুখের ভাষা ছিল অসংযত। শিব-গঙ্গা-গৌরী ও অন্যান্য নারীরা যে ভাষায় বাক্-বিতণ্ডা করেছে তা কোন শিক্ষিত সমাজের নয়।

মনসামঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় বাঙালীর পারিবারিক চিত্র পাওয়া যায়। সে সময় পারিবার ছিল একান্নবর্তী এবং পুরুষ হত পরিবারের কর্তা। গৃহকর্ত্রী হিসেবে নারীর প্রতিষ্ঠা খুব একটা ছিল না। পুরুষরা গৃহের বাইরে উপার্জন করত এবং পারিবারিক নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করত। নারী স্ত্রী হলেও অনেকটা দাসীর মত আশ্রিতা ছিল; তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে খুব একটা মূল্য দেওয়া হত না। মনসামঙ্গলে স্ত্রীকে ফাঁকি দেওয়া, প্রতারণা করার প্রবণতা খুব বেশী। শিবঠাকুর, চাঁদ সদাগর, সঙ্কর গাড়রী প্রত্যেকেই স্ত্রীকে অত্যন্ত অবহেলা করত, এমন কি স্ত্রীর নিকটে কদর্য বাসনা প্রকাশ করতেও সঙ্কোচ বোধ করত না। সাধারণ বাঙালী পরিবারে পিতা-মাতা-সন্তানাদি নিয়ে একত্রে বসবাস করা হত। ধনী পরিবারে দাস-দাসী, ঝি-চাকর নিয়ে একত্রে পরিবারের মত বসবাস করত। তবে পারিবারিক আদর্শ বলতে যা বোঝায় তা খুব একটা ছিল না, কেননা পুরুষ সংসারে কর্তৃত্ব করলেও গৃহিণীর কোন

মর্যাদা ছিল না। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের পরিবার একটি বৃহৎ উচ্চবিত্তের পরিবার, শিবঠাকুরের পরিবার উচ্চবর্ণের নিম্নবিত্তের পরিবার, আর জালু-মালু কিংবা বচাই এর পরিবার নিম্নবর্ণের ও নিম্নবিত্তের পরিবার। নিম্নবর্ণের পরিবারে মায়ের কর্তৃত্ব থাকত অনেক বেশী।

মনসামঙ্গলে মধ্যযুগীয় বাঙালীর পারিবারিক সম্পর্কের দিকটিও লক্ষ করার মত। সমাজে বহুবিবাহ ও ঘরজামাই প্রথা প্রচলিত থাকায় একান্নবর্তী পরিবার বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় জর্জরিত থাকত। সপত্নী সমস্যা প্রবল থাকায় সপত্নী কলহ অনিবার্য ছিল। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুরের দুই পত্নী গঙ্গা-গৌরীর কলহ বর্ণনা একটি অন্যতম বিষয়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখা যায় শিবঠাকুর মনসাকে গৃহে নিয়ে এলে গৌরী সতীন ভেবে মনসাকে প্রহার করতে থাকে এবং গঙ্গা এই কার্যে বাধা দিলে গঙ্গা-গৌরী কলহ সৃষ্টি হয়। গৌরী গঙ্গাকে বলে—

"অনুচিত আমি করি শাস্তি দিবে ত্রিপুরারি
তুমি নহে শাস্তির ভাজন।" (বিজয়/৫১)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনের ছবি আছে।সেখানে শিবের প্রথমা স্ত্রী গঙ্গা জানিয়েছে—সে বৃদ্ধা হওয়ায় রূপ যৌবনহীনা হয়েছে, তাই শিব বৃদ্ধকালে সতীন এনে দিচ্ছে—

"গঙ্গা বোলে গোসাঞি বয়সে হৈলু হীন।
বৃদ্ধকালে দিলে প্রভু দারুণ সতিন॥" (জগজ্জীবন/৪০)

গঙ্গা শিবঠাকুরকে সপত্নী কলহের সম্ভাবনা সম্পর্কে শিবকে সাবধান করে দিয়েছে –

"গঙ্গা বোলে শুন স্বামী কহিতে বুঝিনু আমি
যে ধন পাইলা গুণমণি।
বয়সে হইনু হীন রূপে হৈনু নির্ঘিন
বৃদ্ধকালে দিলেন সতিনী॥
পাছে না করিহ রোষ দুই নারীর যত দোষ
নিরবধি দ্বন্দ্ব কাচাল।
প্রথমে যুবতীর মুখ দুইতে না হবে সুখ
অবশেষে হইবে জঞ্জাল॥" (ঐ/৫২)

সপত্নী কলহের জ্বালায় অনেক পুরুষ গৃহত্যাগ করত। শিবঠাকুর গঙ্গা-গৌরীর কলহের জ্বালায় গৃহত্যাগ করেছে-

"শিব বোলে দ্বন্দ্ব তোরা কর দুই জনে।
সাজ নন্দী বৃষ আমি যাবো পুষ্পবনে।" (ঐ/৭০)

কামুক, অকর্মণ্য পুরুষ সংসারের দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হত না। এমন কি সংসারের খবরাখবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করত না। সন্তানের জন্মদান করে তার প্রতি দায়িত্ব পালন করত না। গোয়ালিনীবেশিনী গৌরীর গর্ভে শিবের সন্তান জন্মালে সেই সন্তানের খোঁজ না নেওয়ায় গৌরীর আক্ষেপ —

"দ্বাদশ বৎসর হৈল আমার গণেশ।
তথাপি শঙ্কর দেব না কৈল উদ্দেশ॥" (ঐ/৭৫)

সপত্নীজাত সন্তানের সঙ্গে বিমাতার সুসম্পর্ক কখনোই হত না। মনসাকে গৌরী ভাল চোখে দেখেনি; মনসা সতীন নয় জেনেও সে তাকে প্রহার করে এবং তার এক চোখ কানা করে দেয়। শুধু তাই নয়, গৌরীর কারণেই জরৎকারু মনসাকে বিবাহ রাত্রেই পরিত্যাগ করে, শিবঠাকুর মনসাকে বনবাসে দেয়, এমন কি চাঁদ সদাগরকে মনসার বিরুদ্ধে উত্ত্যক্ত করে প্রতিষ্ঠায় বাধা দান করে। বাস্তবে সপত্নীজাত সন্তানের প্রতি ছিল বিমাতার এমনি ক্রোধ। শিব বিষপানে অচেতন হলে নারদ দেবগণের অনুরোধে মনসাকে আনতে গেলে মনসা দুঃখ করে বলে —

"পিতা বর্তমানে সতা রহিতে না দিল তথা
কেমনে জাইব তার লক্ষে
কে পালিবে আমা সভা কেবা আর দিবে বিভা
কান্দে দেবী ভাবি মন-দুঃখে।" (বিপ্রদাস/৩৭)

এখানে মনসা চরিত্রের বাস্তবতা ও আত্মসম্মানবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কাব্যে সপত্নী কন্যার প্রতি বিমাতার ব্যবহারের সুন্দর চিত্র আছে। এর মধ্যে দিয়ে বাঙালী নারীর মানসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। মনসা শিঙ্কাকুরকে বাঁচাবার জন্য যেতে চায়, কিন্তু নারদকে জানিয়ে দেয় একখানি ভাল বস্ত্র না হলে সে যেতে পারছে না। তার বিমাতা যদি একখানি বস্ত্র নিয়ে আসে তবে সে শিবকে বাঁচাতে যাবে।মনসার কথা নারদের মুখে শুনে চণ্ডী বেছে বেছে একটি অতি সাধারণ বস্ত্রমনসার জন্য নেয়—

"শুনি চণ্ডী শীঘ্র গেলা আপনার ঘরে
ভালো বস্ত্র লৈতে সত্ত কিছু নাহি পুরে।
হাত পাঁচ কাচা-খানি কাঁকতলে থুয়্যা
চলিল সত্বরে দেবী সখীগণ লৈয়া।" (ঐ/৩৮)

মনসা দেবসমাজে বিমাতার এই ব্যবহারের কথা প্রকাশ করে দেয় —

"দেখ দেখ অপরূপ সকল দেবতা
যত্নে এই বস্ত্র মোরে দান কৈল সতা॥" (ঐ)

মনসা চরিত্রের এই ব্যক্তিত্বের দিকটিকে বিপ্রদাস সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু চণ্ডী মনসার প্রতি ক্রোধবশত-

"ক্রোধে চণ্ডী উঠিল তেজিয়া লাজ-ভয়
মারিবারে মনসারে মুষ্টিক উঠায়।" (ঐ)

বিজয় গুপ্তের কাব্যেও মনসার পারিবারিক জীবনের ছবি আছে। মনসার বিষে চণ্ডী ঢলে পড়লে দেবগণের অনুরোধে মনসা চণ্ডীর প্রাণদান করে। চণ্ডী লজ্জিত হয়ে মনসাকে স্বীকার করে নেয়, বৃদ্ধ জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। জরুৎকারু মনসার পিতাকে অপমানসূচক কথা বলে – "ভাঙ্গড়ার ঝি তুই কিসে অপমান।" (বিজয়/৮৫)। মনসার বিষে জরৎকারু অচেতন হলে শেষপর্যন্ত সে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। কিন্তু মনসা জরৎকারু কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে—

"অপরাধ ক্ষমা কর রাখ রাঙ্গা পায়ে।
স্ত্রী লোকের অপরাধ ক্ষমিতে উচিত হয়ে॥" (বিজয়/৯১)

জগজ্জীবনের কাব্যে গঙ্গা ও গৌরী শিব-কন্যা মনসাকে অনেক সহজভাবে মেনে নিলেও শিবের ব্যবহারে এবং মনসার কারণে ঘরদুয়ার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে গৃহত্যাগ করতে চায়। গৌরী বলেছে—

"মররে ভাঙ্গড়া তোর মুখে নাহি লাজ।
বারম্বার দুঃখ দিস করিয়া অকাজ॥
মনেত জানিস কন্যা হয় বিষহরি।
লুকায়া আনিস কেনে করণ্ডিত করি॥
তোর যত ঘরদ্বার পোড়ায়া ফেলাব।
গঙ্গা দুর্গা দুই জনে দেশান্তরি যাব॥
... ...
দুর্গা বোলে গঙ্গা আমার বচন।

ঝিউ লৈয়া ঘর করোক ত্রিলোচন॥
বাপের সহিত ঘর করোক বিষহরি।
তুমি আমি দুই জনে যাই দেশান্তরি॥" (জগজ্জীবন/৮৮-৮৯)

শেষ পর্যন্ত শিবঠাকুর মনসাকে বনবাস দেয়, মনসা এক ব্রাহ্মণের গৃহে দাসীবৃত্তি করে –

"ব্রাহ্মণী গেল এক ব্রাহ্মণের বাড়ী।
ব্রাহ্মণের ঘরে রহে হৈয়া নিজ চেড়ী॥
সফল দিনে দেবী কর্ম্মকার্য্য করে।
এক মুষ্টি অন্ন পায় ব্রাহ্মণের ঘরে॥" (ঐ/৯০-৯১)

এদিকে গঙ্গা ও গৌরীর শোকে শিব সমুদ্রমন্থনজাত বিষ ভক্ষণ করে অচেতন হয়ে পড়ে, মনসা শিবের বিষনাশ করে প্রাণ ফিরিয়ে দেয়। জরৎকারুর সঙ্গে মনসার বিবাহ হয়। কিন্তু গর্ভবতী মনসাকে সামান্য কারণে জরৎকারু পরিত্যাগ করে। পথে মনসার পুত্র আস্তিকের জন্ম হয়, অসহায় মনসা রাখালগণের কাছে দুধ, জেলেদের কাছে মাছ চেয়ে ছেলেকে খাওয়ায়, এ ভাবে বার বার পরিবার ও সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়। মনসার পুত্রসন্তান জন্ম হলে চণ্ডী মনসার দুগ্ধ হরণ করে। সপত্নী কন্যা ও বিমাতার কলহে শিব বিষ পান করে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য শিব মনসাকে বনবাসে দেয়। আবার বিমাতার প্রতিও সপত্নী সন্তানের সুস্থ মানসিকতা ছিল না। মনসা বিমাতার দ্বারা বার বার লাঞ্ছিত হয়ে তার প্রতি বিরূপ হয়। প্রথমে সে চণ্ডীকে দংশন করে অচেতন করে। আবার বিষপানে শিবের মৃত্যু হলে চণ্ডী সহমরণে যেতে চাইলে মনসা অগ্নিকার্য করতে এসে চণ্ডীর মুখে অগ্নিসংযোগ করে —

"অগ্নি হাতে লইয়া পদ্মা আসিলা কৌতুকে।
শিবের মুখ এড়িয়া অগ্নি দিল দুর্গার মুখে॥" (বিজয়/১০৯)

মনসার বিষে চণ্ডী ঢলে পড়ে, শিব বিলাপ করলে মনসা তাকে আশ্বস্ত করে —

"মনসা বলেন বাপু মনে দেহ ক্ষেমা
আর একশত বিভা করাইব তোমা।" (বিপ্রদাস/৩৯)

বিজয় গুপ্তের মনসা বলে —

"মরিয়া গেল বাপু তোমার বালাই লইয়া।
আর এক ঋষির কন্যা করাইয় বিয়া॥" (বিজয়/১১০)

আবার জগজ্জীবনের কাব্যে সপত্নী পুত্ররা মায়ের পরামর্শে বিমাতা পার্বতীকে নদীতে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করেছে -

"মধ্য নদীত দুই ভাই করে ঠারাঠারি।
মায়ের সতিন দুর্গাক ডুবাইয়া মারি॥" (জগজ্জীবন/৪২)

আবার মনসামঙ্গলে শাশুড়ী, পুত্রবধূ, ননদ-ভাজের সম্পর্কও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বাঙালী ঘরে শাশুড়ী ও পুত্রবধূর সম্পর্ক খুব মধুর ছিল না, তাই লখীন্দরের মৃত্যুর জন্য সনকা বেহুলাকেই দায়ী করেছে। ননদ-ভাজের সম্পর্কও মধুর ছিল না। মৃত লখীন্দরকে নিয়ে দেবলোকে যাত্রাকালে বেহুলার ভাইরা তাকে ফিরিয়ে নিতে গেলে বেহুলা জানায় —

"বেউলা বলে ভাই তুমি না বল উচিত।
স্বামী অভাবে নারী জীবন কুৎসিত॥
চাউল দিবা কাষ্ঠ দিবা আর দিবা হাঁড়ি।
তোমার বধূয়ে বলিব বেউলা কাঁচা রাঁড়ি॥" (বিজয় /৪৫৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলা ভাইদের বলেছে—

"বেহুলা কহিল আমি হই কড়্যা রাঁড়ী।
কত-না পেলাব আর নিরামিষ্য হাঁড়ি॥
মা-বাপের বাড়ী মোরে আর নাহি সাজে।
সকল ভাউজ-সঙ্গে নিত্য দ্বন্দ্ব বাজে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৬৪)

স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কের সুস্থতা ছিল না পূর্বে সে কথা উল্লেখ করেছি। অনেক সময় দুশ্চরিত্র পুরুষ পরনারীর কারণে স্ত্রী ও মাতাকে মারধর করে তাড়িয়ে দিত। জগজ্জীবনের কাব্যে গোদার বৃত্তান্তে সে কথা পাই —

"শীঘ্রগতি গেল গোদা আপনার বাড়ি।
লাথি দিঞা ভাঙ্গিল ভাতের যত হাঁড়ি॥
দুই ভার্য্যাকে বোলে তোরা বাহিরাঞা যাঅ।
দুই পুত্র লৈয়া তোরা ভিক্ষা মাঙ্গি খাঅ॥
তরাসে পলায়ে কাণী আর খুঁড়ী।
শয্যা হৈতে পলায় গোদার মাঅ বুড়ি॥" (জগজ্জীবন/২৭১)

পরিবারে সন্তান এবং নারীরা একান্তভাবে পিতা ও স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রীরা শ্বশুরের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হত। চাঁদের ছয় বিধবা পুত্রবধূ তার পরিবারের একজন হয়ে বসবাস করত। লখীন্দরের মৃত্যুর পর বেহুলার দেবলোকে যাত্রার সংকল্পের কথা শুনে সনকা জানায়—

"শিশু যুবা অবলা যাহার পতি মরে।
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে॥" (ক্ষেমানন্দ/২৬১)

বস্তুত স্বামী ছাড়া নারীরা একান্ত অসহায় ছিল, তাই বংশীদাসের কাব্যে জরৎকারু মনসাকে পরিত্যাগ করলে মনসার অসহায়তা ও কাতরোক্তি সে সময়ে নারীর অবস্থান নির্দেশ করে —

"পতি ধন পতি প্রাণ, পতি স্ত্রীর জীবনধন,
পতি বিনে নারী নিরূপায়॥
তুমি প্রভু সুপুরুষ, অবলা নারীর দোষ,
একবার ক্ষমিতে জুয়ায়।" (বংশীদাস/৫৮)

মনসামঙ্গল কাব্যে যে দেবদেবী ও মানব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তা বাঙালী চরিত্রের অনুবর্তন মনে করি। সমাজ চরিত্রের প্রকাশ ও বিবর্তন মানব চরিত্রের মধ্যে দিয়েই ঘটে থাকে, তাই মঙ্গলকাব্যে মানব চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ সামাজিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বলে গণ্য করি। প্রথমে মনসা চরিত্রের কথাই বলা যাক। ব্রাহ্মণ্যশাসিত মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থায় জাত মনসা ধীরে ধীরে খল হয়ে উঠেছিল। কুলীন পুরুষের অবৈধ সন্তান মনসা, আবাল্য পিতৃমাতৃ স্নেহবঞ্চিত, পুরুষের লালসার শিকার, বিমাতার দ্বারা লাঞ্ছিত, বিবাহ রাত্রে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্ত, সমাজ থেকে বহিষ্কৃত মনসা ধীরে ধীরে ক্রুর হয়ে ওঠে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসা বনবাসে গিয়ে দাসীবৃত্তি করেছে, কিন্তু দাসত্বের অন্নে তার রুচি হয়নি। বিপ্রদাসের মনসা সমাজের কাছে বিমাতার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে, এখানে তার ব্যক্তিত্বের দিক লক্ষণীয়। জগজ্জীবনের কাব্যে মনসা চেয়েচিন্তে পুত্র পালন করেছে এবং সবশেষে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে নারীর এই প্রতিষ্ঠা সুগম হয়নি। চাঁদের দ্বারা বার বার সে লাঞ্ছিত হয়েছে, এমন কি নারীও তাকে সমর্থন করেনি। কিন্তু তার পূজা প্রচার আসলে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। সহজে যা পাওয়া যায় না তাকে কেড়ে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা। গৌরী ঈর্ষাপরায়ণ গ্রাম্য বধূ, শিবঠাকুর নৈতিক চরিত্রহীন গ্রাম্য বৃদ্ধ, চাঁদ সদাগর দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী জমিদার, বণিক

সমাজের মধ্যমণি ও অর্থকৌলীন্যের মূর্ত রূপ। যদিও তার চরিত্র মধ্যযুগীয় বাঙালীর চরিত্র নয়, তার উগ্র ব্যক্তিত্ব মধ্যযুগের মানব চরিত্রে লক্ষ করা যায় না। সনকা সন্তান বৎসল বাঙালী জননী, সনকা চরিত্রে দুঃখসহনীয় রূপ ও বাঙালী নারীর অসহায়তা ফুটে উঠেছে। লখীন্দর অর্থবান পিতার অকর্মণ্য সন্তান। বেহুলা বাঙালী ঘরেরই পুত্রবধূ, পিতামাতা, ভায়ের আদরে প্রতিপালিত বাঙালী ঘরের কন্যা। স্বামীর মৃত্যুতে সকলেই তাকে দোষারোপ করলে বেহুলা অবশ্য ক্ষীণ প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। জগজ্জীবনের বেহুলা সনকাকে বলেছে —

"মরিল পুত্র তুমার মোর কুলক্ষণে।
আর ছয় পুত্র তুমার মারিল কেমনে॥" (জগজ্জীবন/২৪৩)

স্বামীর মৃত্যুতে বাঙালী বধূর অবস্থা বেহুলা জানত বলেই কারো অনুরোধ-নিষেধ না মেনে দেবলোকে অনির্দেশ্যলোকে যাত্রা করে। সেখানে সে সমাজের কামুক চোখকে উপেক্ষা করে সকলকে সন্তুষ্ট করেছে, স্বামী, শ্বশুরের ঘর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। কাপুরুষের মত অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। বাঙালী বধূর দুঃখ সহনীয় রূপ ও সংগ্রামী মানসিকতা তার চরিত্রে প্রকাশিত। চাঁদের হাতে মনসাপূজা হয়ত পুরুষের হাতে নারীর স্বীকৃতি। বেহুলা ও মনসা একই বাঙালী পরিবারের দু'টি সদস্যের মত, একজন কন্যা, একজন বধূ। বাঙালী পরিবারের কন্যারা অনেকাংশে অবহেলিত হয়, বধূরা হয় লাঞ্ছিত; দু'জনেই স্বামী হারা, দু'জনেই প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং দু'জনেই বিদ্রোহিনী। একজন বঞ্চিত হয়ে অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট হয়েছে, একজন আদরে প্রতিপালিত হলেও সমাজে ও পরিবারে তার অবস্থানগত সত্যকে বুঝতে পেরেছিল এবং এর মধ্যে থেকেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। সুতরাং মনসা ও বেহুলা দু'জনেই বাঙালী সমাজের প্রতিভূ নারী চরিত্র। মনসা বিদ্রোহ করতে গিয়ে জঙ্গী মনোভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে, আর বেহুলা আপন সিদ্ধান্তে অটল থেকে নিঃশব্দে প্রতিবাদ করে গেছে। উভয়েই বহু পুরুষের লালসার শিকার হয়েছে। দু'জনেই এক সাথে সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বেহুলা ছাড়া মনসার প্রতিষ্ঠা সম্ভব ছিল না, বেহুলা বাঙালী সমাজে নারীর অবস্থানগত সত্য বুঝেছিল তাই নারীর স্বভাবজ ধর্মকে গ্রহণ করেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

মনসামঙ্গলে বাঙালী নারীর মানসিকতা ও স্বভাব-চরিত্র আত্মপ্রকাশ করেছে, যা থেকে সেকালের বাঙালীর স্বভাবগত দিকটিও জানা যায়। যেমন গ্রামীণ নরনারীর প্রবণতাগুলি—চণ্ডী মনসাকে প্রহার করলে প্রতিবেশী মহিলারা সকলেই ধীরে ধীরে জমায়েত হয়ে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে। চণ্ডী মনসাকে প্রহার করলে গঙ্গা বলে,— এতে পাড়া প্রতিবেশী সকলেই হাসবে, তাই মনসা জমায়েত সকলকে লক্ষ করে বলে —

"বাপু ঘরে আসিলে কহিয় সত্য কথা॥
সুচরিত্রা বসুমতী জয়া বিজয়া।
সবাই যাও ঘরে কেন মারে মহামায়া॥" (বিজয়/৫৪)

আবার ক্রুদ্ধ পদ্মাকে দেখে ভয়ে সকলেই পালিয়ে যায় –

"যত পরনারী সব আছিল বিস্তর।
পদ্মার মুখ দেখিয়া সকল দিল লড়।" (ঐ/৫৫)

আবার চণ্ডী অচেতন হয়ে পড়লে –

"চণ্ডী ঢলিল হেন সবে দেখিল লক্ষণ।
বায়ুবেগে আইল সবে পুরনারীগণ॥" (ঐ / ৫৭)

বিবাহকালে পুরনারীরা কিভাবে উৎসুক হয়ে বর বা কনে দেখতে আসে, বিবাহ বাসরে উপস্থিত নারীগণের হাস্য পরিহাস, আচরণ সবই বাঙালী সমাজের নিজস্ব। তারা উৎসব অনুষ্ঠানে সকলেই সমবেতভাবে অংশ গ্রহণ করত, সাহায্য-পরামর্শ করত, বিপদেআপদে পাশে দাঁড়াত। আবার পল্লীসমাজের ক্ষুদ্রতার রূপটিও এই কাব্যেই আত্মপ্রকাশ

করেছে বেহুলা বা পার্বতীর পরীক্ষা দানের অংশগুলিতে। আবার চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা বা চৌদ্দ ডিঙা ডুবানো অংশগুলিতে বাঙাল মাঝির আচরণ, কথাবার্তা বাঙালী সমাজের নিজস্ব বিষয়, যা বাঙালী সমাজ ব্যতীত অন্যত্র লভ্য নয়। এভাবে বাঙালীর মৌলিক বিশেষত্ব মনসামঙ্গলে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মনসামঙ্গলের ঘটনাগতক্ষেত্রেও বিভিন্ন প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়ে বাঙালীর সমাজ ইতিহাসের নানা উপাদান পাওয়া যায়। যেমন, দেবদেবীদের ঘন ঘন ছদ্মবেশ ধারণ, নারীদের সহেলা পাতানো ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি। ছদ্মবেশ ধারণের মধ্যে দিয়ে যেমন সামাজিক বিধিনিষেধ ইত্যাদির বহিঃপ্রকাশ করে, তেমনি সই পাতানো বা সহেলা পাতানো গ্রামীণ বাঙালী সমাজেরই একটি বিশেষ প্রবণতা। যেমন নিজের নামের সঙ্গে মিলে গেলে কিংবা স্বামীর নামের সঙ্গে মিলে গেলে সহেলা পাতানোর রীতি আজও দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি ডোমনীবেশিনী চণ্ডী খেয়া পারের পাটনীকে বলেছে-

"একই নাম জানিয়া বোলে তুমি আমারই সই।" (বিজয়/২৭)

বিপ্রদাসের কাব্যে দধি পসারিনী বেশে মনসা ভূবনমোহিনী রূপ ধারণ করে সঙ্কর গাড়রীর শিষ্যদের ভোলায় এবং পরে তার স্ত্রী কমলাকে মোহিত করে। সঙ্কর গাড়রীর স্ত্রী কমলা নামের মিল পেয়ে খুশি হয় এবং —

"নিজ নাম কমলা শুনিয়া কুতূহলে।
সহি সহি বলিয়া মনসা কৈল কোলে॥" (বিপ্রদাস/১০৫)

আনুষ্ঠানিক ভাবে সহেলা পাতানোর জন্য অনেক সময় একটি ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হত এবং নানান দ্রব্য ভেট দেওয়া হত—

"সহেলা করিবে দুহে সানন্দ বদনে
নানা দ্রব্য আনিয়া আনিল আইয়গণে।
নানা দ্রব্য গন্ধপুষ্প আনিল কমলা
পরম সানন্দে দুহে করিল সহেলা।" (ঐ)

এছাড়া বোন, দিদি, মাসী পাতানো, ভাই পাতানো ইত্যাদি বাঙালী সমাজেরই বিশেষ প্রবণতা। এর মধ্যে দিয়ে বাঙালী নারীর সহজ সরল রূপ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এর জন্য তাদের অনেক সময় কঠিন মূল্য দিতে হত, মনসামঙ্গলে সে বিষয়টিও প্রকাশ পেয়েছে।

জাতি-বৃত্তি ঃ মনসামঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগীয় জাতি বৃত্তির পরিচয় পাই। সেকালে চার বর্ণের প্রাধান্য থাকলেও ছত্রিশটি জাতি তৈরী হয়েছিল তার বিবরণ পাওয়া যায়। জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত কঠোরভাবে পালিত হত। সামাজিক জাতি বিন্যাস অনুসারে গ্রামে বসতি স্থাপন করা হত। প্রধানত ব্রাহ্মণরা নগরের কেন্দ্রে এবং তারপর বৈদ্য, কায়স্থ, ক্ষত্রিয়রা বসবাস করত, আর অপেক্ষাকৃত নগরের বাইরের দিকে অন্যান্য জাতি ও অন্ত্যজরা বসবাস করত। চর্যাপদে যে জাতি বিন্যাসের চিত্র পাই তারই অনুবর্তন মনসামঙ্গলে দেখা যায়। তবে চৈতন্য-পূর্ব যুগে মুসলমানগণের সঙ্গে হিন্দুর সহাবস্থান সম্ভব ছিল না। সম্ভবত তারা স্বতন্ত্র এলাকায় বসবাস করত। শুধু তাই নয়, হিন্দু সমাজেরই বিভিন্ন জাতের মানুষরা অনেক সময় স্বতন্ত্র এলাকায় বসতি স্থাপন করত, যেমন - রাখালগাছি, হাসনহাটি, মালাপাড়া, বারুইপুর ইত্যাদি গ্রামের নামের দ্বারা বোঝা যায় ঐ সকল জাতির মানুষ সেখানে বসবাস করত। হাসনহাটি মুসলমান সম্প্রদায়ের গ্রাম। বিপ্রদাস সিজুয়াতে মনসার বসতি স্থাপনের বিবরণ দিয়েছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তীর আগে বিপ্রদাসের কাব্যেই বসতি স্থাপনের বর্ণনা পাই। বিপ্রদাসের বর্ণনায় চার বর্ণ ব্যতিরেকে ছত্রিশ জাতির বসতি স্থাপনের কথা পাই। তবে এই বর্ণনায় মুসলমান জনবসতির বিবরণ নেই। কবির বর্ণনানুসারে —

"প্রথমে ব্রাহ্মণ বৈসে জানে শাস্ত্রনীত
ক্ষেত্রি বৈশ্য বৈদ্য বৈসে কাএস্থ হরষিত।

ভট্ট দৈবজ্ঞ গোপ বারই কুমার
পঞ্চ বণিক বৈসে আর কর্মকার।
বাদ্যপূরক কলু কুশলি কাঠুর্য্যা
শাঁখারি কাঁসারি বৈসে তামলি সেকরা।
তাঁতি জুগী মালাকার রজক নাপিত
ছুথার গাড়ার বৈসে হৈয়া হরষিত।
ধীবর তিয়র মালা বৈসে নদীকূলে
হরিষে ছত্রিশ জাতি বৈসে কুতূহলে।" (ঐ /১৯)

বিজয় গুপ্ত ও জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রাকালে নানা জাতির মানুষের সমাগম দেখা যায়। লখীন্দরের বরযাত্রায় ভীত সকল শ্রেণীর মানুষের পলায়নের চিত্র পাওয়া যায়, তাতে নানা জাতির, নানা বৃত্তির মানুষের পরিচয় পাই। বিজয় গুপ্তের কাব্যে গন্ধবণিক, ব্রাহ্মণ, ভাট, মালী, বৈদ্য, ওঝা, তেলী, ধোপা, গোয়ালা, সুবর্ণবণিক, জেলে, ডোম, কামার, কুমার, নাপিত, নটী, যোগী বা জুগী, গণক, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, ছুতার, করাতি, তাঁতি শ্রেণীর কথা আছে, এরা প্রত্যেকেই বৃত্তিজীবী শ্রেণী। এরা বিভিন্ন বৃত্তিতে থেকে জীবিকা নির্বাহ করত। বিজয় গুপ্তের বিবরণে –

"চৌদ্দশত চলিয়াছে কুলীন সজ্জন।
তিন শত ভাট চলে নয় শও ব্রাহ্মণ॥
... ...
দুই শত ছুতার চলে তিন শত করাতি।
তিন শত কারিকর চলে এগার শত তাঁতি॥"(বিজয়/৩৬৮-৩৬৯)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেও বৃত্তিজীবী শ্রেণীর বিবরণ পাওয়া যায় —

"পলায় ব্রাহ্মণ ফেলায়া পুঁথির ভার।
ক্ষেত্রী জাতি পলায় বিকি কিনি যার॥
বৈশ্য জাতি গোয়াল পলায় বনে ঝাড়ে।
চাষা শূদ্র পলায় কৃষিকর হাল ছাড়ে॥
ঠেটারী পশারি পলায় কামার সোনার।
চারি জাতি পলায়া যায় ঘোড়াপিড়া আর॥
সূতাহার পলায় আর কুম্ভার জাতি।
মালি জাতি পলায় হাতে লৈয়া কাতি॥
ভাট ভিখারী পালায় আর ব্রাহ্মণ জাতি।
কোলের ছাওয়াল ছাড়ি পলায় পুয়াতি॥" (জগজ্জীবন/১৮২-১৮৩)

হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের ব্যবধান ছিল অনেক বেশি; ছোঁয়াছুয়ি, বাছ-বিচার তো ছিলই, নিম্নবর্ণের অন্ন-জল পর্যন্ত বর্ণহিন্দুদের কাছে অগ্রহণীয় ছিল। উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা নিম্নবর্ণের ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না এবং তাদের অত্যন্ত নীচু নজরে দেখত। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই ব্যবধান ছিল বেশী, তবে পরবর্তীকালে এই ব্যবধান অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে আসে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি ডোমনী বেশধারী চণ্ডীকে দেখে শিবঠাকুর মুগ্ধ হলে ডোমনী শিবঠাকুরকে বলেছে –

"ডোমনি বোলে তুমি ব্রাহ্মণের বেটা।

ব্রাহ্মণ হইয়া ডোম হরিবা কূলের রবে খোটা॥" (বিজয়/ ৩৭)

তাই ছদ্মবেশিনী চণ্ডী শিবকে বলেছে, তুমি যদি আমার হাতে ভাত খাও তবে তোমায় আলিঙ্গন দিব, কেননা চণ্ডী জানে ডোমের অন্ন ব্রাহ্মণের অগ্রহণীয়। তাই চণ্ডী বলেছিল —

"স্বরূপে আমারে লইয়া বঞ্চিতে থাকে মন।
আমি রন্ধন করি তুমি করহ ভোজন॥" (ঐ/৩৯)

নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগর মনসাকে যে কথাগুলি বলে তাতে দেখা যায় উচ্চবর্ণের লোকেরা সকলের ঘরে আহার করত না। এমনকি উচ্চবর্ণের লোকে নিম্নবর্ণের ঘরে আহার করলে সমাজে পতিত হত। কবির বর্ণনায়–

কষ্ট করহ জে জদি সত্য কহিতে উচিত।
হও তোমি সিবের কন্যা হইয়াছ পতিত॥
জাতিহিন জাতি তোমি না করি বিচার।
জেই পূজা পূজে তোমি জাও খাইবার॥
পঞ্চ কোলিন মধ্যে আমি যে কোলিন।
কোন কালে কোন কর্ম্ম না করিচি হিন॥" (নারায়ণ/২৮০)

বিপ্রদাসের কাব্যেও ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর নৌকায় পার হতে গিয়ে শিব ডোমনীর আলিঙ্গন প্রার্থনা করে। তখন গৌরী বলে —

"আমি মলমূত্রধারী অতিহীন জাতি
আমা পরশিলে তোর রহিবে অখ্যাতি।" (বিপ্রদাস/১০)

এর মধ্যে দিয়ে বর্ণহিন্দুর ভ্রষ্টাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাসের কাব্যে সকল জাতির মানুষ লখীন্দরের বিবাহে বরযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেছে, সেখানে জাতিগত ভেদাভেদ রক্ষিত হয়নি। মনে হয় চৈতন্য-পূর্ব যুগেই জাতিগত সংমিশ্রণের প্রবণতা শুরু হয়েছিল— তারই পরিচয় বহন করে এ সমস্ত বর্ণনা। চৈতন্য-পরবর্তীকালে এই ভেদাভেদ অনেক সহজ হলেও জাতিভেদ ছিল। সমাজে জেলে, মালো, ডোম সমাজের মানুষরা অস্পৃশ্য ছিল, ক্ষেমানন্দের কাব্যে জালুমালু মনসাকে বলেছে —

"কেমত তোমার প্রাণ : হেথায় মৎস্যের ঘ্রাণ : দাণ্ডাইতে নাহি বাস ঘৃণা।
... ...
ছাড়িয়া আমার ঘর : যাহ তুমি স্থানান্তর : অনোচিত হেথায় বিশ্রাম।
পবিত্র তোমার দেহ : পাছে আস্যা দেখে কেহ : দাণ্ডাইলে ধীবরের ঘরে॥
... ...
মোর ভাঙ্গা ঘর গোটা : চৌদিগে মৎস্যের কাঁটা : চরণ রাখিতে নাই ঠাঁই॥(ক্ষেমানন্দ/১৪৫-১৪৬)

রাজনৈতিক চালচিত্র : মনসামঙ্গলে তৎকালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক চালচিত্র খুব একটা পাওয়া যায় না, তবে কোথাও কোথাও ভগ্নাংশ মাত্র পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের কবিগণ প্রকৃত পক্ষে রাজনৈতিক জীবন সংস্পর্শের বাইরে সুদূর গ্রামে বসবাস করতেন। সুতরাং রাজনৈতিক তরঙ্গ ভঙ্গ সাধারণ মানুষের ও কবিদের জীবনে প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে পারত না। রাজনৈতিক ওঠাপড়া তাদের জীবনে যেটুকু প্রভাব ফেলেছে সেটুকুই তাঁরা অভিজ্ঞতার আলোকে বর্ণনা করেছেন। কখনো কখনো কবিরা স্থানীয় শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছেন বা দূর থেকেই তাদের প্রত্যক্ষ করেছেন, এভাবেই কবিরা কাব্যে সন-তারিখ উল্লেখ করতে গিয়ে শাসকের নাম উল্লেখ করেছেন, কখনো প্রশংসা করেছেন, তার বেশী কিছু বলেননি। বস্তুত আধ্যাত্ম চেতনায় আস্থাশীল বাঙালী নিজস্ব

ধর্মাচরণ নিয়ে থাকত, ইহলৌকিক প্রসঙ্গে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করত না। মনসামঙ্গলের দুজন কবি বিজয় গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই কাব্যে হুসেন শাহের নামোল্লেখ করেছেন। বিজয় গুপ্ত হুসেন শাহের প্রশংসা করে বলেছেন —

"সমরে দুর্জ্জয়ে রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কামসম॥
যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে (অ)ধিক।
মুলুক ফতোয়াবাদ বাঙ্গ রোর (া) (তম)সিক॥" (বিজয়/৮)

একইভাবে অন্যান্য কবিগণ রাজা বা জমিদারের নামোল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা অন্য তথ্য পাওয়া সম্ভব না হলেও বোঝা যাচ্ছে হুসেন শাহের আমলে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রজারা সুখেশান্তিতে ছিল। মনসামঙ্গলে তুর্কী আক্রমণ অব্যবহিত পরবর্তীকালের কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের দিক থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু সমাজপতিগণ সমাজ রক্ষার প্রয়োজন থেকেই নিম্নবর্ণের হিন্দুসমাজকে আপন করে নিচ্ছিল। আর এযুগে সুগঠিত রাষ্ট্রশক্তি বলতে কিছু ছিল না, রাষ্ট্রীয় অরাজকতা এবং এদেশীয় হিন্দুদের পাশাপাশি বসবাস করতে এসে তারা ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করত মাত্র, অবশ্য এবিষয়ে তাদের অন্যতম হাতিয়ার ছিল ধর্মপ্রচার। সুশাসন কায়েম ও ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য তাদের আগ্রহ দেখা যায়নি। মনসামঙ্গলে 'হাসন-হোসেন' পালায় সেকালের স্থানীয় মুসলমান শক্তির বিবরণ পাওয়া যায়। চৈতন্য-পূর্ব যুগের কবি বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস পিপিলাই হাসন-হোসেন পালা বর্ণনা করেছেন, নারায়ণ দেব তার অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ এবং দ্বিজ বংশীদাস হাসন-হোসেন পালা বর্ণনা করেছেন, অবশ্য মনে হয় পূর্ববর্তী কবিদের লক্ষ রেখেই এই বর্ণনা তাঁরা করেছেন। ভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মীয়চেতনাযুক্ত দু'টি সম্প্রদায় পাশাপাশি বসবাস করার ফলে পরস্পরের ধর্মাচরণ ও সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তা পেয়ে বিধর্মী হিন্দুর প্রতি মুসলমানরা অত্যাচার শুরু করেছিল। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ' কাব্যে হাসন-হোসেন ও কাজীর সাম্প্রদায়িক মনোভাব ধরা পড়েছে। মুসলমান কাজী বিনা কারণেই রাখালগণের পূজা নষ্ট করে, এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। বিজয় গুপ্ত মুসলমান কাজীর মনোভাব সম্পর্কে লিখেছেন—

"শুনিয়া কুপিল কাজি এক দৃষ্টে চায়॥
এমত কিহে হিন্দুয়ান বেটা এতেক গুমান।
শালা হেন না দেখে বেটা যত মোছলমান॥
কোন আক্কল হিন্দুয়ান বেটা নহে দেখে হেড়া।
হেড়া কাটিয়া আজি খিলামু চামড়া॥" (ঐ/১২৬)

সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার অভাবেই এই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি প্রবল হয়ে উঠেছিল, এই ঘটনাকে রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থারই ফলশ্রুতি বলা যায়। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিনের সহাবস্থানের কারণেই পারস্পরিক বৈরিতার অবসান ঘটে।

মনসামঙ্গলে বাহ্যিক রাজনীতি অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ রাজনীতিই অধিক প্রকটিত। গ্রাম্য কবিগণের রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা বেশী না থাকলেও তারা স্থানীয় শাসনকর্তা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় শাসকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রাদেশিক শাসকগণ মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত, কেন্দ্রীয় শাসককে প্রাদেশিক শাসকদের মাঝে মাঝে দমন করতে হত; সুতরাং তার প্রতিক্রিয়া হত গ্রামীণ সমাজব্যবস্থার উপর। মনসামঙ্গলের মনসা বা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীগণ মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী, স্বেচ্ছাচারী শাসকেরই প্রতিভূ। মনসামঙ্গলে বর্ণিত হাসান-হোসেন পালা প্রকৃতপক্ষে হিন্দু ও মুসলমান দুই শ্রেণীর ক্ষমতা দখলের লড়াই। মনসামঙ্গলের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি

প্রকৃতপক্ষে ভিলেজ-পলিটিক্স মাত্র। মনসা নারী হলেও একজন দক্ষ রাজনীতিকের মত কাজ করেছে। তার পরামর্শদাত্রী হল নেতা ধোপানী। প্রতিপত্তি বিস্তার করতে মনসা নেতার পরামর্শ মত কাজ করেছে। হাসন-হোসেনের কাজী রাখালগণের মনসাপূজায় বাধা দিয়ে মধ্যযুগীয় শাসকের মত হিন্দুর ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করেছে। মনসার নেতৃত্বে সর্পসৈন্যগণের লড়াই হিন্দুর ক্ষমতা দখলের লড়াই। মনসা প্রতিপত্তি বিস্তার করতে গিয়ে প্রথমে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের সমাজে সহায় ও সম্পদের প্রলোভনে আনুগত্য আদায় করেছে। মনসা পূজার বিনিময়ে মানুষকে ধন-ঐশ্বর্য প্রদান করল, অর্থাৎ ধর্ম পরিবর্তনের বিনিময়ে সুযোগ-সুবিধা ও ধন-সম্পদ প্রদান মধ্যযুগীয় রাজনীতির কৌশল। ক্ষেমানন্দের কাব্যে নেতা মনসাকে পূজা প্রচারের কৌশল সম্পর্কে বলেছে —

"ধনপুত্র বর : দিবে গ বিস্তর : যে জন তোমারে সেবে।
উপদেশ ভাষা : শুন গ মনসা : যদি না জানহ তবে॥
.....
এ তিন ভুবনে : পূজে যেইজনে : তারে আমি করি দয়া॥
তার যত ঐরি : আমি দূর করি : ঠেকাইয়া কাল সাপে।
যে জনা না পূজে : বিপরীত বুঝে : তারে দিব মনস্তাপে॥" (ক্ষেমানন্দ/৮৫)

ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে আশ্রয় করার প্রবণতা সমাজে বিশেষভাবে দেখা যায়।সাধারণ মানুষের ক্ষমতাশালী শাসকের বিরুদ্ধে যাবার শক্তি ছিল না, তাই মনসার ঘটবারি জালুজননীর নিকট থেকে সনকা নিতে চাইলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে বলতে হয় —"রাজরাণী কি করিতে পারি।"(বিপ্রদাস/৮৮)। আবার সমাজ চরিত্র পরিবর্তনের ফলেই বংশীদাসের মনসামঙ্গলে সনকাকে অর্থ দিয়ে ঘটবারি নিতে হয় এবং সনকার মধ্যেও একটা আপোষের মনোভাব দেখা যায় —

"কোন মুখে কহিব লইতে ঘটবারি।
বল করি লহ যদি কি করিতে পারি॥
শুনাই বলেন কহ তুমি গাবরালি কথা।
বল করি লব কেনে লহত মান্যতা॥
শতপণ সুবর্ণ আগে লহত বুঝিয়া।
ঘটবারি দেহ মোরে সানন্দিত হৈয়া॥" (বংশীদাস/৭২)

ক্ষমতাবানের সঙ্গে মানুষ আপোষ করেই চলতে চায়, শাসক ও প্রজার সম্পর্কের এ দিকটি মনসামঙ্গলে প্রকাশিত। জগজ্জীবনের কাব্যে চাঁদ সদাগরকে স্বয়ং শিব মনসাপূজা করতে বললে চাঁদ উত্তর দেয়—

"ক্রোধ হইয়া বোলে চান্দো শুন শূলপাণি।
এক মহাদেব বিনে অন্য নাহি জানি॥
গঙ্গাজল থাকিতে কেনে অন্য জল খাই।
বটবৃক্ষ ছাড়ি কেন সহড়াতলে যাই॥" (জগজ্জীবন/১১৪)

মনসা কূটনীতি প্রয়োগে রাজনীতিবিদের মত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মধ্যযুগীয় শাসকগণ বিপক্ষীয়কে স্বপক্ষে আনতে ধন-সম্পদ ও উচ্চপদ প্রদান করত - মনসাও এই নীতি গ্রহণ করে। তবে উচ্চবর্ণের সমাজে তার স্বীকৃতিলাভ সহজ হয়নি। সমাজের উচ্চবিত্তের মানুষের স্বীকৃতি না পেলে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা কঠিন. তাই চাঁদের মত মানুষের পূজা প্রয়োজন ছিল। এজন্য অর্থের দ্বারা বশীভূত করতে না পেরে বার বার আঘাত করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে বশে আনা হত। মনসা চাঁদের সর্বনাশ করে মনোবল ভেঙ্গে দেয় এবং পরে বেহুলার মধ্যস্থতায় সমর্থন আদায় করে।

মধ্যযুগে অনবরত যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত। এর ফলে সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা থাকত না। যে পথে শাসকের সৈন্যদল গমন করত সে পথে গ্রাম নগরাদি ধ্বংস হয়ে যেত। ফলে জনসাধারণ সৈন্য আগমনের সম্ভাবনা দেখলেই পালিয়ে আত্মরক্ষা করত। মনসামঙ্গলে লখীন্দরের বিবাহের শোভাযাত্রা, হৈচৈ, আলোক, মশাল, বন্দুকের আওয়াজ শুনে সাধারণ মানুষ গ্রাম ছেড়ে পলায়ন করে –

"বিল পাড়া দিয়া জায় চাঁদো নৃপবর
সম্মুখে দেখিল রাজ্য ধাহুলি নগর।
হস্তী ঘোড়া ঠাট আদি বিবিধ বাজন
দেখিয়া সকল প্রজা হইল ত্রাস-মন।
ধনপুত্র গোধনাদি সকল তেজিয়া
পলায় সকল লোক স্ত্রী পুত্র লইয়া।" (বিপ্রদাস/১৮৫)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যেও এই একই বিবরণ পাওয়া যায়–

"বানিয়ার পরদল কৌতুকে হৈল পার।
হরসাধুর দেশত হৈল চমৎকার॥
পালায় সহরিয়া লোক মুক্ত মাথার কেশ।
কুন রাজা যুঝিতে আইল মোর দেশ॥
বৃদ্ধ যুবক যত পলায় ছাওয়াল।
সৈন্য সহিতে পলায় নগরের কোটাল॥" (জগজ্জীবন/১৮২)

সাধারণ মানুষের জীবনে নতুন নতুন দেবতার আবির্ভাব ঘটত অর্থাৎ শাসকের উৎপাত ঘটত, তাই সাধারণ মানুষ ভয় পেত। জালু-মালুর গৃহে ছদ্মবেশী মনসার আবির্ভাব ঘটলে জালু-মালু বলে –

"দেখ্যা মনে বাসি ভয় : দেহ মোরে পরিচয় : তোমার চরণ যুগে পড়ি।" (ক্ষেমানন্দ/১৪৫)

এ সমস্ত ঘটনা মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক অবস্থাকে নির্দেশ করে। সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার অভাবে প্রজার ধনপ্রাণের নিরাপত্তা তো ছিলই না এমন কি পথঘাটও নিরাপদ ছিল না। চোর, ডাকাত, দস্যুদের অত্যাচার ছিল। নারীদের নিরাপত্তা ছিল না, তাই বিদেশী পুরুষরা নদীপথে ভাসমান বেহুলাকে দেখে নানারূপ অশালীন মন্তব্য করে। শিবঠাকুর একাকিনী মনসাকে পুষ্পবনে দেখে বলেছিল —

"এ বনে অসুর চরে নারী নাহি তুমি পরে
হেন রূপ বেশ কে না লোভ করে।" (বিজয়/২২)

বেহুলার দেবলোকে যাত্রাকালে পথের বিপদের কথা ভেবে জ্ঞাতিগণ শঙ্কিত হয়। বংশীদাসের কাব্যে পথের বিপদের কথা ভেবে বেহুলাও শঙ্কিত হয়েছে –

"স্ত্রী আমি নারী জাতি যথা তথা ভয়।
জাতি কুল সত্যধর্ম্ম রহে বা না রয়॥" (বংশীদাস/২০৪)

বেহুলা সরোবরে স্নানে যেতে চাইলে তাই তার মা ভীতা হয়েছে –

"ঠগঠামন চোর সব সরোবরে থানা।
ধরিয়া হরিবে তোকে রাখে কুন জনা॥" (জগজ্জীবন/১৭০)

অনেক সময় মুসলমানগণ ধর্মবিদ্বেষের কারণেও হিন্দুর বাড়িতে চুরি ডাকাতি করত। নারায়ণ দেবের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগর মুসলমান চোর, ডাকাত, দস্যুদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে –

"হুসেন হাসনের নিকটে আমার পুরি।

না জানি রাজ্যেত কিবা হইল ডাকা চুরি॥" (নারায়ণ/৫৫)

বস্তুত মধ্যযুগের নিস্তরঙ্গ গ্রামীণ জনসমাজের সঙ্গে রাজা-মহারাজা বা সম্রাটের কোন সম্পর্ক থাকত না। যুদ্ধবিগ্রহ হলে তাদের জীবনে প্রভাব পড়ত। তাছাড়া কর আদায়ের সময়ে জমিদারের কর্মচারীরা গ্রামে আসত কর আদায় করতে। প্রজাদের নিকট থেকে পথ কর, জল কর, সম্পদ কর আদায় করত। ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে জল কর আদায়ের কথা পাওয়া যায়। জেলেরা মাছধরে বিক্রি করলে জমিদারকে জল কর দিতে হত, কিন্তু সকলের পক্ষে নিয়মিত কর দেওয়া সম্ভব হত না। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায়—

"গোপাল গোবিন্দ দাস : মৎস্য ধরে বারমাস : সাধুরে না দেই জলকর।" (ক্ষেমানন্দ/১৩৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর মধ্যযুগীয় জমিদারের মত অত্যাচারী, তাকে নিয়মিত কর দিতে না পারলে প্রজাদের বেগার শ্রম দিতে হত। অনেক সময় অত্যাচারের ফলে প্রজারা ভিটামাটি পরিত্যাগ করে চলে যেত। জালুমালু চাঁদ সদাগরকে সে কথাই বলেছে—

"ধীবর-তনয় বলে শুন সদাগর।
এতদিনে ছাড়িলাঙ তোমার নগর॥
একভাই করি তব কোটালি বিষয়।
পাকা খন্দে মাহিনা না দেহ মহাশয়॥
আর ভাই বটি তব সঙ্গের চাকর।
নিত্য নিঞা মৎস্য খাঅ ডাগর ডাগর॥
তোমার আরতি হৈল মৎস্য শতভার।
নগরে থাকিতে তবে না পারিব আর॥" (ক্ষেমানন্দ/১৩৭)

ক্ষেমানন্দও মুকুন্দ চক্রবর্তীর মত আত্মবিবরণী দিয়েছেন, তাতে উল্লিখিত হয়েছে বারা খাঁর মৃত্যুর পর কবির পিতা শাসকের অত্যাচারে দেশত্যাগ করেছিলেন—

"রণে পড়ে বারা খাঁ : বিপাকে ছাড়িব গাঁ : যুক্তি করে জননী-জনক।
দিনকথ ছাড়্যা যাই : তবে সে নিস্তার পাই : দেয়ানে হইল বড় ঠক॥
শ্রীযুত আস্কর্ণরায় : অনুমতি দিল তায় : যুক্তি দিল পলাবার তবে।
শুনহ মণ্ডল তুমি : উপদেশ কহি আমি : গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে॥"(ঐ /৫)

কিন্তু নগর পরিত্যাগ করাও সহজ ছিল না, কারণ অবাধ্য হলে প্রজাদের নিপীড়ন করা হত —

"এইখানে অঙ্গীকার কর দুইভাই।
মৎস্য নাহি দিবে যদি গাড়ি একুঠাঁই॥
এত শুনি জালু মালু ভয়ে কম্পমান।
জালু বলে মালু ভাই নাহি পরিত্রাণ॥" (ঐ/১৩৭)

এ সকল বর্ণনা শাসকের নিপীড়নকেই নির্দেশ করে। বিশেষত স্থানীয় জমিদারগণ প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করত ক্ষেমানন্দের সমসাময়িক কালের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে তার পরিচয় আছে। সুতরাং স্বল্প হলেও সেকালের রাজনীতির প্রভাব পড়েছে জনজীবনে, যাকে সমাজ ইতিহাসের বিশেষ প্রসঙ্গ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক চালচিত্র : মধ্যযুগীয় বাংলার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল কৃষি; তাছাড়া পাশাপাশি বাণিজ্য ও শিল্প কিছুটা ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে। তুর্কী বিজয়ের পর রাষ্ট্রনৈতিক অব্যবস্থার ফলে অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রনৈতিক স্থিতাবস্থা ফিরে এলে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটে মনসামঙ্গলে তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যায়।

মুদ্রা ব্যবস্থা ঃ সুলতানি আমলে এবং মোগল যুগে মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বলবৎ ছিল। মুহম্মদ বিন তুঘলক নতুন মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন এবং আলাউদ্দিন খলজি মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যমান নির্ধারণের জন্য বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন। মোগল আমলে মোটামুটি শেরশাহ প্রবর্তিত মুদ্রা ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। সাধারণত স্বর্ণ, রৌপ্য এবং তাম্র এই তিন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। দৈনন্দিন জীবনে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য সর্বনিম্ন মুদ্রামান ছিল 'কড়ি'। মনসামঙ্গল কাব্যে কড়ির ব্যবহার দেখা যায়। কড়ি হিসাব নিকাশের জন্য 'কড়া', 'গণ্ডা', 'পোণ', 'কাহন' ইত্যাদি একক ব্যবহার করা হত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে কড়ি গণনার একক হিসেবে 'পোণ' বা পণের ব্যবহার পাই। চাঁদ সদাগর চার 'পোণ' কড়ি দিয়ে কি করবে তার হিসাবে দিয়েছে —

"এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন॥
এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া কেলা খামু॥
এ(ক) পোন দিয়া আমি নটী নৃত্য চাব।
এক পোন দিয়া আমি সোনকা ভেটিব॥' (বিজয়/২৯২)

বিপ্রদাসের কাব্যেও কড়ির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চাঁদ সদাগর কড়ি দিয়ে কি করবে, তার পরিকল্পনা করেছে–

"কচুর পাতায় কড়ি লইল বাঁধিয়া।
ধীরে ধীরে নগরে প্রবেশ করে গিয়া॥
এই কড়ি দিয়া আজী কিনিব বসন।
আর কাষ্ঠ আনি অন্ন করিব ভোজন॥"(বিপ্রদাস/১৫৯)

নারায়ণ দেবের কাব্যে কড়ি পরিমাপক বা গণনার একক হিসাবে 'বুড়ি'র ব্যবহার আছে। 'বুড়ি' হল 'কুড়ি' সংখ্যার কথ্য রূপ। 'বুড়ি' হল পাঁচ গণ্ডা বা এক পোণের চার ভাগের এক ভাগ। নারায়ণ দেবের বর্ণানুসারে —

"এক বাড়ি নিল মৎস্য আড়াই বুড়ি হইল।
আর বাড়ি নিল মৎস্য এক পোন হইল॥
তথায় না দিয়া মৎস্য নিল আর বার।
ছয় বুড়ি পাইয়া মৎস্য বেচিল সদাগর॥" (নারায়ণ/২১০)

আবার কয়েক 'পোণ' (পণ) কড়ি মিলে এক 'কাহন' হত। বংশীদাসের কাব্যে পাই –

"ডোমনী বলে হের দেখ নানা চিত্র ফুল।
পঞ্চ কাহন কড়ি হয় বিউনির মূল॥
আড়াই কাহনে বেচি এক গোটা খারি।
বেচিবারে আনিয়াছি তোমার বলয়ারি॥" (বংশীদাস/২৪৩)

রুপার মুদ্রাকে বলা হত 'তঙ্কা' বা টাকা। স্বর্ণমুদ্রাকে মোহর বা আশরফি বলা হত। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ক্রয় বিক্রয়ের জন্য স্বর্ণমুদ্রার ব্যবহার খুব কমে গিয়েছিল। সাধারণ মানুষ কখনো স্বর্ণমুদ্রা চোখেও দেখেনি এমন তথ্য পাওয়া যায়, জগজ্জীবনের কাব্যে এক যুবক বলেছে –

"এক যুবক বোলে শুন যত যুবক ভাই।
সোনার মোহর আমরা কভু দেখি নাই॥" (জগজ্জীবন/৩৩৮)

তাছাড়া এযুগের আদানপ্রদানের অন্যতম মাধ্যম হল 'বস্তুবদল' প্রথা। মনসামঙ্গলে চাঁদের বাণিজ্য বিবরণে বস্তুবদলের কথা পাই। ব্যবসা-বাণিজ্যও বিনিময় বা বদল প্রথায় চলত তার সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে। একালে

দৈনন্দিন জীবনে জিনিসপত্র পরিমাপে 'সের', 'আধ সের', 'পোয়া' ইত্যাদি একক ব্যবহৃত হত। পরিমাপক যন্ত্র ছিল প্রধানত তরাজু বা দাঁড়িপাল্লা, তাছাড়া 'কাঠা' বা 'খুচি' পরিমাপেও আদান-প্রদান করা হত।

মধ্যযুগীয় সমাজে কাঞ্চন মূল্য স্বীকৃত ছিল না, কিন্তু কাঞ্চন কৌলীন্যে বণিক সম্প্রদায় সমাজের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হয়েছিল। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুদ্রা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল এবং মুষ্ঠিমেয় কিছু লোকের হাতে তা জমে উঠেছিল। সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে কাঞ্চন কৌলীন্য ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং মুদ্রাই সমস্ত কিছুর পরিমাপক হয়ে ওঠে। জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের বর্ণনানুযায়ী –

"এই কোড়ি মাতাপিতা এই কোড়ি জন্মদাতা
এই কোড়ি সংসার-সংহতি।
এই কোড়ি রহে যার সংসারের পূজা তার
কোড়ি হেতু সব বশ ধন।
জগতমোহিনী নাম কোড়ি বড় অনুপাম
নিকড়িয়া নিষ্ফল জীবন॥" (ঐ/১২৯)

কৃষি : মধ্যযুগীয় অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। দেশের বেশীর ভাগ মানুষ কৃষিকাজ করত। বাংলার ভূমি ছিল অত্যন্ত উর্বর, কৃষকরা স্বল্প শ্রমে প্রচুর শস্য উৎপাদন করত। মনসামঙ্গলে শিবঠাকুর কৃষক সমাজের দেবতা এবং মনসা ও সাপ উর্বরতা শক্তির সঙ্গেই সম্পর্কিত। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল ধান। বাংলার ভূমিতে বিভিন্ন ধরনের ধান উৎপন্ন হত, সেগুলি ছিল বিভিন্ন স্বাদে গন্ধে ভরপুর; বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। ধান ছাড়াও পাট, শন, তিল, সরিষা, রাই, আখ, কার্পাস চাষ হত। নানা রকম মসলা— হলুদ, মরিচ, আদা, জয়িত্রী, জিরা, লবঙ্গ, পোস্ত উৎপন্ন হত। মনসামঙ্গলে ঐ সমস্ত ফসলের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন ধরনের ফল— আম, নারিকেল, কলা, জাম, কাঁঠাল, তাল, বেল, সুপারি, পান প্রায় সর্বত্রই উৎপন্ন হত। প্রয়োজন মেটানোর পর উদ্বৃত্ত ফসল রপ্তানি হত; চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা ও বস্তুবদল বর্ণনায় ঐ সকল কৃষিজাত দ্রব্যের পরিচয় পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে বাংলাদেশের চাষ পদ্ধতির পরিচয় আছে এবং চাষবাসে কি পরিমাণ শ্রমদান করতে হত তার কথা পাই জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন কাব্যে শিবঠাকুরের চাষবাসের প্রসঙ্গ আছে। জগজ্জীবনের কাব্যে শিবঠাকুরের চাষবাসের বর্ণনানুযায়ী—

"লাঙ্গল জুড়িয়া এক চাষ দিল আগে।
প্রথম দিনের চাষ হাল নাহি লাগে॥
আর বার দিল দেব দুই তিন চাষ।
চার চাষে ভূমিখানের উপাড়িল ঘাস॥
পঞ্চচাষ দিল হর ছয় চাষ হইল।
সাত চাষে শুকায়া সকল ঘাস মৈল॥
আট চাষ দিল আর দিল চাষ নয়।
চাষে চাষে ভূমির থুকুড়া হৈল ক্ষয়॥
দশ চাষ চষিয়া এগার চাষ দিল।
বার চাষে ভূমিখান প্রচ্ছিন্ন করিল॥
বার পাট মোই দিল দেশের ঠাকুর।
থুকুড়া বাছিয়া দেব ঢেল কৈল চুর॥
কস্তুরি কেতুকির চারা ফেলিলে ঠাকুর।

ঈশ্বর ঠাকুরের ফুল মেলিল অঙ্কুর॥" (ঐ/২২-২৩)

জগজ্জীবন শিবঠাকুরের ফুল চাষের বর্ণনা দিয়েছেন, মধ্যযুগে ফুল চাষও কৃষিজ উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে গুরুত্ব পেয়েছিল। মনসার মালিনী বেশে ফুল বিক্রির প্রসঙ্গ পাওয়া যায় বিভিন্ন মনসামঙ্গলে। ধান চাষের কথাও পাই মনসামঙ্গলে। ডিঙা ডুবির ফলে চাঁদের দুর্দশা ঘটলে চাঁদ সদাগর কৃষাণ বৃত্তি গ্রহণ করেছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে ব্রাহ্মণের ধান চাষের প্রসঙ্গ আছে, বিজয় গুপ্তের কাব্যে জগাই মণ্ডলের ধান চাষের কথা আছে, ধান চাষের পরিচর্যার কথা আছে। যেমন—

"এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনে মনে পাছি।
ধান্য নিড়াইতে চান্দোর হাতে দিল কাঁচি॥
ধান্য নিড়ায় চান্দ মনে বাসে ভাল।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা পাতিল জঞ্জাল॥
ধান্য না চিনে চান্দো সবে চিনে দুর।
ধান্য কাটিয়া চান্দো কৈল ভুর ভুর॥" (বিজয়/২৯৫)

নারায়ণ দেবের কাব্যে কলাই বা ডাল চাষের প্রসঙ্গ পাই—

"মন স্থির করি চান্দো পথ মেলিল।
গৃহস্থের কালাই খেত সমুখে দেখিল॥
এক মুষ্টি কালাই তবে লইল উপারি।
গৃহস্তে খেদায়া নিল হাতে করি নড়ি॥" (নারায়ণ/২১২)

ক্ষেমানন্দের কাব্যে শন চাষের কথা পাই এবং কিভাবে শন থেকে আঁশ নিষ্কাশন করা হত তার বিবরণ পাওয়া যায়-

"সাজ শণ বুন গিয়া সাজ হব গাছ।
সাজ তার জাল বুন্যা ধর‍্যা আন মাছ॥
মনসার এত কথা জালু মালু শুনে।
তখনি লাঙ্গল জুড়্যা সাজ শণ বুনে॥
সাজ শণগাছ হৈল দেবীর কৃপায়।
সাজ সেই শণ কাট্যা জলেতে পচায়॥"(ক্ষেমানন্দ/২৭৭)

বাংলাদেশে প্রচুর পাট উৎপন্ন হত, পাট থেকে বিভিন্ন রকম বস্ত্র তৈরীর বিবরণ আছে বিভিন্ন মনসামঙ্গল কাব্যে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার ডাল, যথা— মটর, মসুরি, মাষকলাই, অড়হর, মুগ; বিভিন্ন প্রকার শাকসব্জি, যা রন্ধন তালিকাগুলিতে উল্লেখ করা হয়েছে তা বাংলাদেশের কৃষিজ পণ্য। নদী-নালা-খাল-বিলে পরিপূর্ণ বাংলাদেশে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিভিন্ন প্রকার মাছের বিবরণ পাই। মনসামঙ্গলে জালু-মালুর কাহিনীতে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের কথা আছে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকার পশুপালন করা হত। গৃহপালিত পশু থেকে প্রচুর দুধ উৎপন্ন হত। তাছাড়াও হাঁস, মুরগী (কুকুড়া) পালন করা হত। বিশেষত মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা হাঁস, মুরগী পালন করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে হাসন-হোসেনের কাহিনীতে পীরের দরগায় মোরগ দানের প্রসঙ্গ পাই। কৃষিজাত পণ্যকে নির্ভর করে বাঙালী সমাজে নানা বৃত্তিজীবীতার সৃষ্টি হয়েছিল। মনসামঙ্গলে কৃষিজীবী সমাজের বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে।

বাণিজ্য : মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার চিত্র আছে। পণ্ডিতদের অনুমান চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য যাত্রা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বিষয় নয়, অনেক পূর্ববতীকালের বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাণিজ্যযাত্রার কথা আছে। চণ্ডীমঙ্গলে রাজার নির্দেশে

বাণিজ্যযাত্রার কথা পাওয়া যায়। পর্তুগীজ ও মগ জলদস্যুদের আক্রমণ এবং বিদেশী বণিকদের অংশ গ্রহণের ফলে ব্যক্তিগত বাণিজ্য হ্রাস পেয়েছিল। যাই হোক বাঙালী বণিকরা একদা সিংহলে বাণিজ্য করতে যেত তার বিবরণ মনসামঙ্গলে আছে। বাঙালী বণিকগণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নির্ভর করে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থান দেখে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিত। দিক্ নির্দেশক কোন যন্ত্র ছিল না, তবে 'মালুম গাছ' বলে এক প্রকার দিক নির্দেশক যন্ত্রের কথা পাই বিভিন্ন মনসামঙ্গলে। বিজয় গুপ্তের কাব্যে চাঁদ সদাগরের দক্ষিণ পাটন গমনে 'মালুম গাছ' ব্যবহারের কথা পাই। যেমন বিজয় গুপ্তের বর্ণনানুসারে —

"প্রভাত সময়ে হইল উদিত দিবাকর।
ধনা বলে সদাগর মোর বচন ধর॥
মালুম গাছ তুলিয়া দেও ডিঙ্গার উপর।
মালুম গাছটা তুলিয়া দিল মধুকর উপর॥
মালুম দিষ্টে বোলে শোন সাধু সদাগর।" (বিজয়/২৪৫)

নারায়ণ দেবের কাব্যে 'মালুম কাঠ' ব্যবহারের কথা পাই। বাঙালী বণিকগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বড় বড় বাণিজ্যতরী তৈরী করাত। বিপ্রদাসের বর্ণনানুযায়ী যে সপ্তডিঙার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে তাতে দেখা যাচ্ছে একেকটি বাণিজ্যতরী বিরাটকায়, প্রচুর ধন-সম্পদ তাতে ধরত। বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের বিবরণ থেকেও বাঙালীর বৈদেশিক বাণিজ্যযাত্রার কথা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য ও বস্তুবদলের যে তালিকা আছে তাতে অতিরঞ্জন থাকলেও তার বাস্তবতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। মনসামঙ্গলের বিভিন্ন কবিদের কাব্যে যে সমস্ত রপ্তানি দ্রব্যের নাম পাওয়া যায় সেগুলি হল— নারিকেল, সুপারি বা গুয়া, পান, খয়ের, পীপুল, জোয়ানি, ফুলবড়ি, কালজিরা, হরিতকী, আমলকি, শুক্তাপত্র, নিম্বপত্র, তেজপাতা, শুঁটকি মাছ, ঘি, কস্তুরী, বিভিন্ন ধরণের শাকসব্জি, বিভিন্ন ধরনের ফল, পাট ও পাটজাত দ্রব্য, বিভিন্ন প্রকার কলাই বা ডাল, পোস্ত ইত্যাদি। তাছাড়াও কাঠ ও বাঁশজাত দ্রব্য যেমন— কাঠের বারকোশ, কৌটো, পিঁড়ি, ডালা, কাঠা, আড়ি, খুচি, কুলা ইত্যাদি। আমদানী দ্রব্যের মধ্যে— মূল্যবান পাথর, মণি-মুক্তা, প্রবাল, সীসা, সোনা, রূপা, শঙ্খ, কার্পাস, কর্পূর, হাতির দাঁত, লবঙ্গ, জায়ফল, জয়িত্রী, গুড়গুক, হিং ইত্যাদি। বিপ্রদাসের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্যযাত্রা অংশের বর্ণনায় পাই-

"প্রচুর করিয়া লএ ঝুনা নারিকেল
খোম-ধুতি খাসা আদি বসন সকল।
নিম্বপত্র সুক্তাপাত আর কাল্যা জীরা
মেথী পাড়ু কুমুড়া জোয়ানী কৈল ভরা।
তৈল ঘৃত মাষ মুগ কলাই সকল
জতনে প্রচুর করি লইল তণ্ডুল।" (বিপ্রদাস/১৪০)

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে বস্তু বদলের চিত্র পাওয়া যায় —

"কাঁচা হরিদ্রা তোলে পুরাণ সুকুতা।
ইহার বদলে নিব পাটনে গজমুক্তা॥
মাসকালাই আদার সুট আর তোলে জিরা।
মরিচ লবঙ্গ দিয়া বদল নিব হীরা॥
যতন করিয়া নেহ কিছু ফুলবড়ি।
এক ভারের বদল নিব দশ ভার কোড়ি।
লক্ষ তিন ভার লেহ কদলীর খার।

এক ভার বদল নিব নোন তিন ভার॥
করুয়া সানকি লেহ লক্ষ দুই চারি।
ইহার বদল নিব সুবর্ণের ঝারি॥
নারিকেল তাল বেল আর কাঠাল আম।
এই সব ফল নেহ আছে বড় কাম॥
দশ শঙ্ক বদল নিব নারিকল।
তাড়িপত্র বদল নিব তালের বদল॥
আমের বদলে নিব অমৃতের ফল।
সুবর্ণের ঘড়া নিব কাঠাল বদল॥
পাটের ধকড়া মেঘলা আর যত শাড়ি।
যতন করিয়া লেহ কাপড়েত জড়ি।
নানা রঙ্গ শাড়ি লেহ করিয়া যতন।
ইহার বদলে নিব পাটের বসন॥
জামির বদলে নিব জায়ফল জাম।
গুবাক বদলে নিব সারি সুয়া নাম॥
শ্বেত চামর নিব দিয়া পাট সন।
ভাড়িয়া আনিব গিয়া দক্ষিণ-পাটন॥" (জগজ্জীবন/১২৪)

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদের বাণিজ্য বিনিময়ের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় —

"দুলাই কাড়ারি বলে রাজা বিদ্যমান।
যে বস্তু বদল করি কর অবধান॥
উত্তম বারকুশ যোড়া তাতে হিঙ্গুলাল।
এ সহ বদলে দিবা সোণা রূপার থাল॥
কাষ্ঠের কটুক লেহ লেখা জোখা করি।
এসব বদলে দিবা লোটা গাড়ু ঝারি।
সনক পেয়ালা হেন এক এক গুটি।
এ সহ বদলে দিবে সুবর্ণের বাটি॥
বড় বড় চাড়িগুলা অধিক সুন্দর।
ইহার বদলে দিবা সোণার ডাবর॥
বড় বড় পিঁড়িগুলা মান্দারের সার।
সুবর্ণের সিংহাসন বদল ইহার॥
ডালা কাঠা আড়ি খুচি বড় বড় কুলা।
ইহার বদলে দিবা সীসা রঙ্গের তুলা॥
যত সব হাড়ি পাগ লইয়া গুণিয়া।
এ সকল নিবা যে পিতল থাল দিয়া॥
আদার বদলে দিবা সোণার গাঠেয়া।
বাঁঙ্গুড়ি বদলে দিবা সোণার মাঠেয়া॥

পোস্তের বদলে দিবা সোণার ঘুংঘুর।
কহিব পোস্তের যত গুণ হে প্রচুর॥
.....
বাখর বদলে দিবা কর্পূর জোখিয়া।
ঝুরি গুয়া দিবা তুমি জাতিফল দিয়া।
তৈল বদলে দিবা যত শিলারস।
মধুতে কুঙ্কুম দিবা ভরিয়া কলস॥
চান্দ বলে এখনে বদলের কার্য্য নাই।
বস্ত্রাদি বদল কিছু করিবারে চাই॥" (বংশীদাস/১৩৪-১৩৫)

বিভিন্ন প্রকার পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র বিদেশে আমদানি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করত বাংলার বণিকগণ। তাছাড়া বাংলার বণিকগণ ও সাধারণ মানুষ অন্তর্দেশীয় হাট-বাজারে বাণিজ্য করত এবং দেশীয় উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বেচাকেনা চলত। জগজ্জীবনের কাব্যে হাটের উল্লেখ আছে, ক্ষেমানন্দের কাব্যে হাসনহাটি হাটের কথা আছে। জালু-মালু দারিদ্র্যের কথা বলতে গিয়ে বলেছে, তারা হাটে সুতা বিক্রি করে, মাছ ও শুঁটকি মাছ বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে।

শিল্প : মনসামঙ্গলে কোন বৃহৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় না, তবে ক্ষুদ্রশিল্পে বাংলার গ্রামগুলি সমৃদ্ধ ছিল। কুটীরশিল্পে বাংলা কতটা সমৃদ্ধ ছিল মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠে তা জানা যায়। বস্ত্রশিল্প, অলঙ্কার শিল্প, অলঙ্করণ শিল্প, সূচীশিল্প, শোলার কাজ, গৃহনির্মাণ শিল্প, বাঁশ ও বেতের কাজ, মৃৎশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায় মনসামঙ্গলে।

বস্ত্রশিল্পে বাংলা কতটা সমৃদ্ধ ছিল তার নানা পরিচয় পাওয়া যায় ইতিহাসে। বাংলার মসলিন এক সময় জগৎ বিখ্যাত ছিল। সোনা ও রূপার সূক্ষ্ম সুতোতে শাড়ী নির্মাণ হত, তা এত মোলায়েম ছিল যে শত হাত শাড়ী মুঠিতে গুটিয়ে রাখা যেত। পাট, শন ও কার্পাস থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার্য বস্ত্র, মশারি, দুলিচা, বিছান, পাছড়া, চাঁদোয়া, সামিয়ানা, পালঙ্ক-পোষ, বালিশ তৈরী হত। বিপ্রদাস, ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ও বংশীদাসের কাব্যে তার সুন্দর পরিচয় পাই। ক্ষেমানন্দের কাব্যে শন থেকে জেলেদের জাল তৈরীর কথা পাই। অলঙ্কার শিল্পের সুন্দর পরিচয় আছে মনসামঙ্গলে। বাংলার স্বর্ণ শিল্পীগণ বিভিন্ন রকম উত্তম গহনা প্রস্তুত করত, গহনা, বস্ত্র ও শাঁখার উপরে নানা অলঙ্করণ করত। বাংলার মেয়েরা শোলার কাজ করত, সূচীশিল্পের কাজ করত। ছুতোররা কাঠ কেটে গৃহস্থালীর নানা উপকরণ খাট, পালঙ্ক, কুর্সী, পিঁড়ি, চৌদোল, নৌবাণিজ্যের উপযোগী বড় বড় বাণিজ্যতরী তৈরী করত তার পরিচয় পাওয়া যায়। ডোমরা বাঁশ ও বেতের কাজ করত, অলঙ্করণ যুক্ত চুপড়ি, ঝুরি, ডালা, করণ্ডি, চালুনী, কুলা, খুচি, আড়ি, ব্যজনী বা পাখা তৈরী করে বিক্রি করত। মনসামঙ্গলে বেহুলার ডোমনী বেশ ধারণ করে বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র বিক্রির কথা পাওয়া যায়। কামারগণ গৃহস্থালী ও কৃষিকার্যের উপযোগী যন্ত্রপাতি তৈরী ছাড়াও লোহার পাত ও রড কাজে লাগিয়ে লোহা পিটিয়ে গৃহনির্মাণ করত, লখীন্দরের বাসরঘর নির্মাণে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কুমাররা কাদামাটির হাঁড়ি-কুড়ি, চাড়ি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, দগড়ি ও প্রতিমা নির্মাণ করত। বিপ্রদাসের কাব্যে কুমারের হাঁড়ি-কুড়ি তৈরীর প্রসঙ্গ পাই চাঁদের দুর্গতি অংশগুলিতে। চাঁদ সদাগর কিভাবে কুমারের হাঁড়ি ভেঙ্গে ছিল তার বর্ণনায় —

"শিরে বোঝা চাঁদো রাজা হইল কাতর
কাষ্ঠ-বোঝা ফেলে হাঁড়ি-পাখই উপর।
দশ বিশ হাঁড়ি ভাঙ্গে কুমার কুপিত
দাড়ি ধরি টানিয়া বেড়ায় চারি ভিত।" (বিপ্রদাস/১৫৯)

শুধুমাত্র দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় বলেই নয়, এই সমস্ত কুটীরশিল্পের উপর বাংলার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল।

জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ মধ্যযুগে কৃষি ও কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য, কুটীরশিল্পের যতই উন্নতি হোক না কেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুফল ভোগ করত মুষ্ঠিমেয় ধনীরা। ব্রাহ্মণরা সমাজের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হবার ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দ্বারা বণিকরা সমাজের শীর্ষদেশে উঠে এসেছিল। বণিক, জমিদার, মহাজন ও রাজকর্মচারীরাই মূলত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ভোগ করত। দেবী মনসা বণিক চাঁদ সদাগরের পূজালাভের প্রয়াসী হয়েছিল, কারণ বণিকরা অর্থ কৌলীন্যের জোরে সমাজের মধ্যমণি হয়ে উঠেছিল। গোটা মনসামঙ্গলের ধারায় বণিক শ্রেণীর প্রাচুর্যের চিহ্ন আছে। তারা নিজেদের উদ্যোগে বাণিজ্য করত, বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ আহরণ করত। তারা প্রধানত কোঠাবাড়িতে বসবাস করত, প্রচুর দাসদাসী, আত্মীয়-পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে থাকত, অনেকে লাঠিয়াল ও সৈন্যবাহিনী রাখত। তারা পুত্রকন্যার জন্মোৎসবে, অন্নপ্রাশনে, বিবাহে, পিতামাতার শ্রাদ্ধবাসরে প্রচুর ব্যয় করত, দানধ্যান করত, পূজা-পার্বণে জৌলুস ও ঐশ্বর্যের পরিচয় দিত। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস বা পরবর্তীকালের ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন, তন্ত্রবিভূতি, দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে লখীন্দরের বিবাহে গোটা গ্রাম, পাড়াপ্রতিবেশী সকলেই অংশ গ্রহণ করেছে। পাইক, পেয়াদা থেকে শুরু করে গ্রামবাসী ও আত্মীয় পরিজনেরা উৎসবে মেতে উঠেছে। বিবাহের শোভাযাত্রায় বিবিধ বাজনা বাজত, বাজী পোড়ানো হত, বন্দুকের গুলি ছোঁড়া হত। নারী পুরুষ উভয়েই উত্তম পোশাক ও বিভিন্ন রকম সোনা-রূপার গহনা পরিধান করত, উত্তম আহারের আয়োজন হত। মনসামঙ্গলে তার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগরের মনসাপূজায় ঐশ্বর্যের ছাপ আছে—

"নানা উপহার জথ তাহা বা কহিব কথ
লৈক্ষে লৈক্ষে হংস কৈতর।
য়গুর চন্দন দিআ কনক কমল পাইআ
হরসিতে পূজে অধিকারি॥" (নারায়ণ/২৮৩-২৮৪)

কিংবা, বংশীদাসের বর্ণনায় সনকার মনসাপূজার বিবরণ —

"সঁড়ি বান্ধিয়া ঘট স্থাপিল আসনে।
নানা উপহারে পূজে অগুরু চন্দনে॥
শত শত মহিষ কাড়া ছাগল গাড়র।
শত শত মৃগ আর হংস কবুতর॥" (বংশীদাস/৭২)

এসমস্ত চিত্র অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে।

দেশের বেশীর ভাগ জনসাধারণ ছিল দরিদ্র। চৈতন্য-পূর্ব যুগের মনসামঙ্গলে ধনীর ঐশ্বর্যের পাশাপাশি দারিদ্র্যের বিবরণ পাওয়া যায়, তবে তা করুণ নয়। রাষ্ট্রীয় কুশাসনের ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়লে সাধারণ জনজীবনে তার খুব প্রভাব পড়ত না বলেই বোধ হয়। কারণ মানুষের গ্রামীণ জীবনে রাজনৈতিক ঘনঘটার প্রভাব পড়ত না, কেননা কৃষি ও শিল্পের দ্বারা মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ হত। তাছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কম থাকায় দরিদ্রদের অভাব ও হতাশা কম ছিল, তবে শাসকের উৎপীড়নে জনসাধারণ দুর্দশার শিকার হত। চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবি ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে জনগণের আর্থিক দুর্গতির চিত্র পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবার রাষ্ট্রনৈতিক ঘনঘটার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল, তার পরোক্ষ ফল ছিল প্রজাশোষণ ও দুর্গতি। ক্ষেমানন্দ যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তাতেও শাসকের অত্যাচারের কথা আছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগরের প্রজাশোষণের চিত্র পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর

জাল্-মালুর ভাইদের দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিয়ে নিত। প্রজারা প্রাণ ভয়ে গ্রাম পরিত্যাগ করতে চাইলেও কিন্তু সহজ ছিল না। শাসকের অত্যাচারকে ক্ষেমানন্দ চাঁদ সদাগরের অত্যাচার রূপে দেখিয়েছেন। তাঁর কাব্যে জালু-মালুর পরিবারের দুর্দশার বর্ণনা আছে। তারা দুই ভাই মাছ ধরে বিক্রি করে, তাদের জননী পরের বাড়ী 'ভাড়া ভানে' অর্থাৎ ধান ভানে, শুঁটকি মাছ বিক্রি করে, সুতা কাটে, পরের বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করে সংসার নির্বাহ করে। কবির বর্ণানুযায়ী –

"চালেতে শুকাল্য মীন : অনুবৃত্তি অনুদিন : মৎস্য ধরি কুলাই ওদন।
জননী কাটনা কাটে : সুতা নিঞা বেচে হাটে : তবে হয় তৈল্য লবণ॥
গিয়া বর্ণিকের পাড়া : জননী ভানএ ভাড়া : চালু খুদ পায় গুটি গুটি।
জালু মালু দুই জেল্যা : বড় দুখিনীর ছেল্যা : মৎস্যকুটা বলে কাঁকতুটি॥
খালই পলই জাল : পাথি পাটা সর্ব্বকাল : ইহা বিনু নাহি সম্ভাবনা।
... ...
হের দেখ জালে তোলা : কমঠ মৎস্যের খোলা : বালুকার বোদালের দাঁড়া।
জালু মাল দুই ভাই : মৎস্য ধর‍্যা অন্ন খাই : জননী পরের ভানে ভাড়া॥" (ক্ষেমানন্দ/১৪৫)

সনকার উক্তিতেও জালু-মালুর পরিবারের দারিদ্র্যের কথা পাওয়া যাচ্ছে। জালুর জননী দেবীর কৃপায় ধনলাভ করলে সনকা বিস্মিত হয়ে বলেছে –

"অতি বড় দুঃখী ছিল জালু মালু দাস।
চালেতে না ছিল খড়, পরিবারে বাস॥
মোর বাড়ী ভাড়া ভান্যা আন খুদকুড়া।
মৎস্য কুটিয়া আন তার পোঁটা মুড়া॥
তৈল্য লবণ মাগ্যা আন চিরদিন।
আজি কেনি দেখি তোর সম্পদের চিন॥" (ঐ/১৪৭-১৪৮)

জগজ্জীবনের কাব্যে বেহুলার দেবলোক যাত্রাকালে 'গোদা' বেহুলাকে তার গৃহস্থালীর বর্ণনা দিয়েছে তাতে তার দারিদ্র্যের ছাপ স্পষ্ট —

"আমার গৃহের কথা কি কহিব পতিব্রতা
দক্ষিণ দুয়ারে ঘরখানি।
মাঝিয়াত নাই মাটি চতুর্দ্দিগে নাই টাটি
বাহিরে না পড়ে তার পানি॥
ঘরে আছে সর্ব্বস্ব ভাঙ্গ আছে দলা দশ
মৎস্যের সুকুটা দলা সাত।
এই ঘাটে মারি মাছ বেচি শ্রীগোলার হাট
দিবা অন্তে এক সন্ধ্যা ভাত॥" (জগজ্জীবন/২৭০)

বিজয় গুপ্তের কাব্যেও ধনা-মনার দারিদ্র্যের বিবরণ আছে। উৎসব, পূজা-পার্বণের বিবরণেও ধনী দরিদ্রের পার্থক্য বোঝা যায়; চাঁদের মনসাপূজা কিংবা হাসন-হোসেনের মনসাপূজায় ঐশ্বর্যের ছাপ থাকলেও জালুমালুর ও রাখালের মনসাপূজায় দারিদ্র্যের ছাপ পড়েছে। বিজয় গুপ্তের বর্ণনানুসারে-

"দিব্য মণ্ডপ ঘর করিয়া গঠন।

তাহাতে স্থাপিল ঘট বিচিত্র লিখন॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিধানে করিয়া।
পুষ্প দূর্বা চন্দন গন্ধ ছাগ বলি দিয়া॥
গীত বাদ্য মহাস্বর করে সর্ব্বজন।
হেন কালে ধেনু বৎস্য দিল দরশন॥" (বিজয়/১২০)

তৎকালীন অনেক কবিরাই দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করতেন। মনসামঙ্গলের অপর এক কবি জীবন মৈত্র অর্থাভাবে প্রদীপের তেলটুকু সংগ্রহ করতে পারেননি। কবি নিজের দারিদ্র্য সম্পর্কে দুঃখ করে বলেছেন —

"শ্রীমিত্র জীবন কবি ঘরে বসি রৈল।
একদিন লিখিতে তাড়ির তৈল ফুরাইল॥" [২৮]

কবি আরও বলেছেন —

"কবির খরচ কিছু নাই
তত্ত্ব ছিল পুর দ্বারা সকল বুদ্ধি লইল হারা
পুথি বাঁধি হাটে চলি যাই॥"[২৯]

আবার অনেকে জুয়া খেলায় সর্বস্বান্ত হত; বিপ্রদাসের কাব্যে জুয়া খেলার ফলে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার চিত্র পাই। কবির বর্ণনায় –

"অনিষ্ট পাপিষ্ট দুষ্ট জুয়ার প্রবল
জুয়া খেলাইতে তার মজীল সকল।" (বিপ্রদাস/২১২)

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে অর্থ কৌলীন্য ও অর্থলালসা প্রবল হয়ে ওঠে, ভোগ ও বিলাসিতা বৃদ্ধি পায়, আর সাধারণ মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না। তাই কবিরা নিরুপায় হয়ে পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনে অর্থই অনর্থের মূল এই সত্য উপলব্ধি করেন। ক্ষেমানন্দ ও জগজ্জীবনের কাব্যে এই উপলব্ধির প্রকাশ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অর্থাভাব ও অন্নাভাব আরও গভীরভাবে প্রকটিত হয়েছিল।

মধ্যযুগে নানা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তারা স্বীয় বৃত্তিতে থেকে জীবিকা অর্জন করত। কামার, কুমার, তাঁতি, নাপিত, জেলে, মালো, কাঠুরিয়া, গোয়ালা, মালী ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষরা বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণী। তাছাড়া অন্ত্যজরা পশুপালন, বাঁশ ও বেতের কাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তারা গৃহে উৎপাদিত কুটীরশিল্পজাত দ্রব্য গ্রামে গ্রামে ফেরি করে বা 'গাওয়ালে' বিক্রি করত। বংশীদাসের কাব্যে ছদ্মবেশিনী চণ্ডী শিবঠাকুরকে বলেছে —

"ডোমনী বলে মোর ডোম গিয়াছে গাওয়ালে।
একাকিনী খেয়া দেই এই ঘাটকূলে॥" (বংশীদাস/৪৩)

জেলেরা মাছ ধরত, কাঠুরিয়ারা কাঠ কেটে বিক্রি করত, কুমাররা হাঁড়ি-পাতিল গ্রামে বা নগরে ফেরি করে বিক্রি করত। চাঁদ সদাগরের ডিঙা ডুবির ফলে বিপর্যয় ঘটলে সে বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করেছে— বিভিন্ন মনসামঙ্গলে এই দৃশ্য দেখা যায়। নারীরাও অনেক সময় উপার্জনে অংশ গ্রহণ করত; বিশেষত নিম্নবর্ণের হিন্দু নারীরা মাথায় করে বিভিন্ন দ্রব্য নিয়ে ফেরি করত। গোয়ালা নারীরা দধি-দুগ্ধের পসার নিয়ে যেত, মালিনীরা মধু, ফুল, ফুলের মালা গেঁথে বিক্রি করত। ধনা-মনা মালির পুত্র, ধনা-মনার জননী বলেছে – "পুষ্প বেচি খাব পুত্র না কর বড়াই।" (বিপ্রদাস/১১৮)। মনসামঙ্গলে দেখি মনসা কখনো মালিনী বেশ ধারণ করে ফুল বিক্রি করেছে, আবার কখনো গোয়ালিনী বেশ ধারণ করে দধি-দুগ্ধ বিক্রি করছে। অন্ত্যজ শ্রেণীর নারীরা খেয়া পারের পাটনীর কাজ করত. আবার ঝাঁটা, কুলা, ডালা ইত্যাদি গ্রামে গ্রামে ফেরি করত। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এই শ্রেণীর মানুষের খুব একটা অস্বাচ্ছন্দ্য না থাকলেও পরবর্তীকালে অর্থনৈতিকক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে পড়েছিল। নারীরা অনেক সময় নটীবৃত্তি গ্রহণ

করত, ধনী গৃহে নাচ দেখিয়ে এরা উপার্জন করত। অনেক সময় এরা দেহোপজীবীতাকেও গ্রহণ করত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসা নটীবৃত্তি গ্রহণ করে চাঁদ সদাগরের মহাজ্ঞান হরণ করেছিল। চতুঃবর্ণ প্রথা অনুযায়ী ব্রাহ্মণদের জীবিকা জ্ঞানচর্চা হলেও নিরঙ্কুশ জ্ঞানচর্চা দ্বারা ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্বাহ হত না। মনসামঙ্গলে সোমাই পণ্ডিতের শিক্ষকতা বৃত্তি দেখা যায়। তাছাড়াও দৈবজ্ঞ, গণৎকার, যজমানি, ঘটকবৃত্তি গ্রহণ করত ব্রাহ্মণরা। বিজয় গুপ্তের কাব্যে দেখি শিক্ষকতার পাশাপাশি সোমাই পণ্ডিত বিধানদাতা ব্রাহ্মণের কাজও করেছে। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্মণরা কৃষিকার্যকেও স্বীকার করেছিল। মনসামঙ্গলে ব্রাহ্মণের কৃষিকার্যের পরিচয় আছে। বিপ্রদাসের কাব্যেও ব্রাহ্মণের কৃষিকার্যের কথা পাই। এক শ্রেণীর মানুষ অন্যের গৃহে দাসীবৃত্তি ও মাহিন্দারী বৃত্তি করত, রাখালরা গৃহস্থের গরু চরাত, মাহিন্দাররা গৃহস্থের ক্ষেতে কাজ করত। কখনো ধনী গৃহে দাস-দাসীর কাজ করত। চাঁদ সদাগরের গৃহে নারীগণের দাসী ও পুরুষগণের দাস রাখার কথা আছে —

"জলক্রীড়া করি সভে উঠিল ডাঙ্গায়।
আস্তে ব্যস্তে সহচরী বসন জোগায়॥
... ...
ছয় ভাই স্নানে গেল হরষিত হইয়া।
জলক্রীড়া করিয়া সানন্দে কৈল স্নান
জার সেই যোগ্য বস্ত্র দাসেতে জোগান।" (বিপ্রদাস/১২৯)

সনকার ঝাউয়া দাসীর কথা মনসামঙ্গলে সুপরিচিত। দাস প্রথা বোধ হয় প্রচলিত ছিল, কেননা বিবাহকালে দাসদাসী উপহার দেওয়ার রীতি দেখা যায়। তাছাড়া চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রায় সঙ্গী মাঝিমাল্লাগণ ছিল তার দাস। এক শ্রেণীর দরিদ্ররা মুটে বৃত্তি করত, তারা গৃহস্থের জিনিসপত্র মাথায় বহন করত। চাঁদ সদাগরের মুটে বৃত্তির কথাও আছে মনসামঙ্গলে। চৈতন্য-পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণরা অনেক সময় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছিল, অন্যান্য বৃত্তি ও কৃষিবৃত্তিকে হারিয়ে ব্রাহ্মণরা ভিক্ষাবৃত্তি আশ্রয় করেছিল। বিশেষত চৈতন্য-পরবর্তীকালে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে মানুষের মিশ্র বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেই এই মিশ্রবৃত্তির প্রতিবেশ গড়ে উঠেছিল। বৃত্তি হিসাবে চাকুরী গ্রহণের প্রবণতা সাধারণ জনসমাজে ছিল না, তবে কিছু লোক সৈন্যবাহিনীতে কাজ করত।

মনসামঙ্গলে মধ্যযুগের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জানা যায়। পর্যটকদের বিবরণ থেকেও জানা যায় সেকালে দ্রব্যমূল্য কত কম ছিল। মনসামঙ্গলে পাওয়া যায়— এক বোঝা কাঠের দাম মাত্র চার পোণ কড়ি। বিজয় গুপ্তের বর্ণানুসারে চাঁদ সদাগর বিপর্যয়কালে চার পোণ কড়িতে একবোঝা কাঠ বিক্রি করেছে – "এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন।" (বিজয়/২৯২) আবার চার পোণ কড়ি দিয়ে চাঁদ সদাগর কি কি করবে তার বিবরণ দিয়েছে। সেকালে এক পোণ কড়িতে এক ভাঁড় দধি পাওয়া যেত। বিজয় গুপ্তের কাব্যে মনসাকে বলেছে –

"বল বল গোয়ালিনী দধির কিবা মূল।
ধর ধর পোন কৌড়ি দধির যেবা মূল॥" (বিজয়/১৭১)

বিপ্রদাসের কাব্যে পাওয়া যাচ্ছে এক ভাঁড় দধির মূল্য মাত্র পঞ্চাশ কাহন কড়ি। চার পোণ কড়িতে এক খানি বস্ত্র পাওয়া যেত, কুমারের নারী চাঁদকে চার পোণ কড়ি দিলে সে কি কি করবে তার বিবরণ দিয়েছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যের বিবরণে পাই এক বোঝা কাঠের দাম মাত্র সাত-আট পোণ কড়ি—

"নগরে বেচিলে বোঝা পাই পণ আট।
জাতি অনুসারে মোরা নিত্য বেচি কাঠ॥" (ক্ষেমানন্দ/২৩৫)

তাছাড়াও রাখালগণের মনসাপূজার আয়োজনে কত পোণ কড়ি দিয়ে কি কি দ্রব্য কেনে তার বিবরণ আছে –

"হাসনহাটির হাট : কড়ি সে কাহন আট : গমন করিল বাসু হর‍্যা।
কিনিল নৌতন ডালা : ছড়াসনে চাঁপাকলা : মূল্য দিল তিন কড়া কর‍্যা॥

.....

নিজ মন পরিতোষে : বস্ত্র কিনে অবশেষে : শতেক কাহন মূল্য যার॥" (ঐ/৯৬-৯৭)

এই বিবরণ অনুসারে খুব কম দ্রব্যমূল্যের কথা পাওয়া যায়। অবশ্য বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেব অপেক্ষা বিপ্রদাস ও ক্ষেমানন্দের কাব্যে অধিক দ্রব্যমূল্যের কথা পাওয়া যায়। জগজ্জীবনের কাব্যে পাই আট-দশ পোণ কড়ি নিয়ে মেনকা দাসী পরিবেষ্টিত হয়ে হাটে যাচ্ছে। তৎকালীন যুগে একজন শ্রমিকের মাসিক বেতন ছিল মাত্র এক টাকা। চাঁদসদাগর বিপ্রকে বলেছে –

"আমি ত কৃষাণ বড় ক্ষেত্রকর্মে অতি দড়
থাকিবো তোমার গৃহবাসে।
ত্রিসন্ধ্যা ভোজন করি চারিখানি বস্ত্র পরি
এক তঙ্কা লই এক মাসে।" (বিপ্রদাস/১৬২)

মধ্যযুগে বিনিময় প্রথার মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয় চলত। বস্তুবদল অংশগুলিতে কবি কল্পনার আতিশয্য থাকলেও দ্রব্যমূল্য কত কম ছিল তা বোঝা যায়। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে কড়ির দুষ্প্রাপ্যতা হেতু মূল্য বৃদ্ধি বলে মনে হত, আসলে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছিল।

ধর্মজীবন ঃ নানা ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রে বিভক্ত ছিল বাঙালীর কৌম জীবন, সুতরাং তাদের আচার-আচরণ, সংস্কার-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনাগত ভিন্নতা ছিল। আবার আর্থসামাজিক কারণে তাদের ব্যবধান ছিল অত্যন্ত বেশী। মনসামঙ্গলে বাঙালী সমাজের ধর্মীয় পরিচয়ে দু'টি প্রধান রূপ দেখা যায়, তা হল হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্ম। মঙ্গলকাব্যগুলি হিন্দুদের কথা নিয়ে রচিত এবং হিন্দু কবিদের দ্বারাই রচিত তাই হিন্দুধর্মই এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের ধারা তখন লুপ্ত হয়ে গেছে এবং সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্ম, নাথধর্ম বৈদিক পৌরাণিক হিন্দুধর্ম এবং লৌকিক ধর্মাচারগুলি মিশ্রিত হয়ে গেছে। তখন সমাজের উচ্চতর পর্যায়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং নিম্নতর পর্যায়ে অনার্য প্রভাবিত লৌকিক হিন্দুধর্ম চর্চা হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলাদেশে ইসলামের প্রসার ঘটতে থাকে। ইসলামের সমর্থকরা তরবারিকে আশ্রয় করলে ইসলামের সর্বগ্রাসিতা থেকে হিন্দুধর্মকে রক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলে লৌকিক ও পৌরাণিক ধর্ম মিশ্রণের সুযোগ পেল। পৌরাণিক বৈদিক ধর্ম মানুষের বাসনা নিবৃত্তিতে ব্যর্থ হলে মনসা, চণ্ডীর মত লৌকিক দেবীরা সমাজে জায়গা করে নিতে থাকল। বাংলার লৌকিক অনার্য সংস্কৃতিতে পালা-পার্বণ, বার-ব্রত প্রচলিত ছিল, যা উচ্চবর্ণের সমাজ সহজে মেনে নেয়নি। মনসাপূজা বহু পূর্ব থেকেই ব্রত আকারে প্রচলিত ছিল। জালু-মালুর ঘরে মনসাপূজা তারই ইঙ্গিত বহন করে। মূলত জেলে, মালো, গোয়ালা চাষীর ঘরেই ব্রতাকারে এই পূজা প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে জালু-মালুর মনসাপূজা, কবির বর্ণনায় –

"রত্নময় সিংহাসনে মনসা বসায়
দুই বধূ লইয়া মঙ্গলগীত গায়।" (বিপ্রদাস/৮৭)

মনসার পূজা প্রচারিত হবার আগেই যে ব্রতাকারে মনসাপূজা হত এখানে সে কথা পাওয়া যাচ্ছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে জালু-মালুর ঘরে মনসা পূজা প্রসঙ্গে মনসার উক্তি –জালু-মালুর জননী মনসার ব্রতদাসী, সুতরাং মনসা আগে তার পূজা নিতে যাচ্ছে। এভাবে ধীরে ধীরে উচ্চবর্ণের নারীর অন্তঃপুরে লৌকিক দেবীর প্রবেশ ঘটে। ক্ষেমানন্দ বেহুলার গুণপনার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে–

"বার মাসে বার ব্রত : পুণ্যতিথি করে কত : দেব কার্য্য করে অবিশ্রাম।" (ক্ষেমানন্দ/২৪৩)

মূলত নারীরাই ব্রতাচারগুলির সঙ্গে যুক্ত থাকত; কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ স্ত্রীদেবতায় আস্থাশীল ছিল না। তাই সহজিয়া বৌদ্ধ সাধকগণ এবং নাথধর্মের গুরু আচার্যরা নারী বিদ্বেষী ছিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণবধর্মে নারী যুক্ত হয় এবং ব্রতকথাগুলি মঙ্গলকাব্যাকার ধারণ করলে পুরুষও ব্রতের দেবীর সঙ্গে যুক্ত হল। শৈব পুরুষ শক্তি দেবীর প্রাধান্য স্বীকার করে নিল। চাঁদ সদাগরের মত ঘোর শৈবও বাম হাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অর্ঘ্য নিবেদন করল। কারণ চণ্ডীর মুখ নিসৃত বাণীতে মনসা ও ভগবতীর অভেদত্ব স্বীকৃত হয়েছে —

"তোমার ঠাই কহি শুন চান্দ সদাগর।
এক মূর্ত্তি আমি সেই নাহি অন্য পর॥
যেই ব্রহ্মা সেই বিষ্ণু সেই মহেশ্বর।
কুবের বরুণ আদি চন্দ্র দিবাকর॥
পদ্মা আমি দেখ তুমি হই এক মূর্ত্তি।
এ বলিয়া সাক্ষাত হইল ভগবতী॥" (বিজয়/৫৩৫)

সুতারাং চাঁদ স্বীকার করল —

"জগতজননী পদ্মা আদ্যের দেবতা।
মুই নহে জানি পদ্মা জগতের মাতা॥" (ঐ/৫৩৬)

পরবর্তীকালের বিশেষত জগজ্জীবন ঘোষাল, ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ সদাগর অনেক বেশী নতজানু। হিন্দুধর্মের সম্প্রদায় গত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে ধর্ম সমন্বয়ের ভাবনাটি চৈতন্য-পূর্ব যুগেই শুরু হয়েছিল। এভাবে অন্যান্য লৌকিক দেবীরাও সমাজে জায়গা করে নিয়েছিল। তাই বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে বহু লৌকিক দেবদেবীর বন্দনা করা হয়েছে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পৌরাণিক দেবদেবীর সঙ্গে বহু লৌকিক দেবদেবী, যেমন বিক্রমপুরের আদ্যা, মৌলার রঙ্কিনী, বালিডাঙ্গার সর্বমঙ্গলা, দশঘরার বিশালাক্ষী, বারাসতের সবেশ্বরী সর্বজয়া, কৃষ্ণনগড়ের গড়েশ্বরী, বালিয়ার সিংহবাহিনী, কালীঘাটের কালী, পুরটের ঘাটু, বেতরে বেতায় আমতার মেলাই, হিজলীর কালুরায়, সেয়াখোলার, উত্তরবাহিনী বন্দীপুরের বিনোদিনী, সিমিলার সুরেশ্বরী, জাজপুরের বিশালাক্ষী, সানিহাটের রক্তবিমলার, ক্ষীরগ্রামের যোগেশ্বরী, কাঙুরের কামিক্ষা বন্দনা করা হয়েছে। মনসামঙ্গলে তন্ত্রধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। সাধু, সন্ন্যাসী, দৈবজ্ঞরা তন্ত্রচর্চার দ্বারা তুক্‌তাক ঔষধীকরণ, বশীকরণ করত। তন্ত্রচর্চার দ্বারা তারা অসাধ্য সাধন করত। তাই পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীর পাশাপাশি ভূত- প্রেত, দৈত্য-দানো বন্দনাও করা হয়েছে। আসলে বাঙালীর কোন নির্দিষ্ট ধর্মবোধ ছিল না, প্রত্যেক দেবদেবীর উপাসনাই তারা করত, বস্তুত বাঙালী পঞ্চোপাসক; তাই মঙ্গলকাব্যে বহু দেবদেবীর বন্দনা লক্ষ করা যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বৈষ্ণবধর্মের প্রবল স্রোতে ভেসে যায় বাংলাদেশ। চৈতন্যদেব পূর্ববতী বৈষ্ণবধর্মকে নতুন মাত্রা দিলেন। বৈষ্ণবধর্ম অন্য ধর্মকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, তাই কবিরা বৈষ্ণব বন্দনা ও চৈতন্য বন্দনা করেছেন। ক্ষেমানন্দের কাব্যে তুলসী মাহাত্ম্য বর্ণনা, চৈতন্য বন্দনা করা হয়েছে। জগজ্জীবন ও বংশীদাসের কাব্যেও বৈষ্ণব বন্দনা আছে। জগজ্জীবনের কাব্য শুরু হয়েছে— "হরি বোলরে ভাই সংসার সকল জলময়।" এই ধুয়া দিয়ে। বংশীদাসের কাব্যে বৈষ্ণব বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, তুলসী বন্দনা আছে —

"নীলাচলে বন্দি প্রভু দেব জগন্নাথ॥
পুষ্প মধ্যে গাই আদ্যে প্রধান তুলসী।
ব্রতমধ্যে প্রধান গাই ভৈমী একাদশী॥" (বংশীদাস/১৩)

তাছাড়া বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ যুক্ত ধুয়া ব্যবহার দেখা যায়। যেমন —

১। হরি বোলরে ভাই সংসার সকল জলময়। ২। আর কি করে ওহো ও। শ্যাম রূপ দেখিতে মধুর॥

৩। হরিমাধব রে হরি বল রাম। ৪। বৃন্দাবন মাঝে কানাই বাঁশী বাজায়। জগজ্জীবন ঘোষাল ও দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখি চাঁদ সদাগর অনান্য তীর্থ ও দেবপূজার পাশাপাশি চৈতন্যতীর্থে পূজা ও বন্দনা করেছে। —

"ঘাটদহে ঘাটেশ্বর পূজে উপহারে।
নবদ্বীপে দেখিল চৈতন্য অবতারে॥" (জগজ্জীবন/১২৮)

চৈতন্য-পরবর্তী বাঙালী সমাজের মুখ্য ধর্ম হয়ে উঠেছিল বৈষ্ণবধর্ম। বৈষ্ণবধর্মে রাধা শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রূপে প্রতিষ্ঠা পেল। এ ভাবে বৈষ্ণবধর্মেও শাক্ত দেবীর প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। তাই দেখা যায় চৈতন্য-পরবর্তী মঙ্গলকাব্যে দেবীদের প্রতিষ্ঠার পথ অনেক সুগম।

মনসামঙ্গল কাব্যে তৎকালীন সমাজের নামকরণগত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। সাধারণত দেব-দেবীর নামের দ্বারা নামকরণ করা হত। তবে লৌকিক শব্দবন্ধেও নামকরণ করা হত, যথা – সনকা, বেহুলা, চাঁদ, বচাই, ইত্যাদি। লৌকিক ভাষা ও জীবনের ছোঁয়া এতে আছে। চাঁদের পুত্র ও পুত্রবধূদের নামকরণ করা হয়েছে কখনো পৌরাণিক দেবতার নামানুসারে, কখনো লৌকিক শব্দবন্ধে। যেমন , শ্রীধর – তারা, বাচস্পতি - সীতা, ভগীরথ - মন্দোদরী, মধুকর - জয়া, দুর্গাবর – বিজয়া, ষষ্ঠীবর - মহামায়া, লখীন্দর-বেহুলা ইত্যাদি। লক্ষণীয় এখানে পৌরাণিক ও লৌকিক শাক্ত দেবীর নাম গৃহীত হলেও বৈষ্ণবীয় অনুষঙ্গ নেই। এই নামকরণগুলি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য (পৃ:৬৯) থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, কিন্তু বেশ বোঝা যায়— যে সময়ে মনসামঙ্গল কাব্য গঠিত হয়েছে তখন সমাজে বৈষ্ণবীয় প্রভাব ছিল না। ধর্মগত প্রবণতায় উচ্চস্তরে শৈব এবং লৌকিক স্তরে শাক্ত ধর্মই প্রধান ছিল। বেদ ও পুরাণ কাহিনীর প্রভাব জনজীবনে ছিল তা এই সমস্ত তথ্য থেকে পাওয়া যেতে পারে।

মুসলমান সমাজ ঃ মনসামঙ্গলে মুসলমান সমাজ সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তবে দেবকথা নির্ভর মঙ্গলকাব্যে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে খুব বেশী তথ্য নেই। তাছাড়া মধ্যযুগীয় বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস মূলত হিন্দুর ইতিহাস, কেননা নবাগত মুসলমানগণ শাসনকার্য ও সাম্রাজ্যের লড়াই নিয়েই এত বেশী ব্যস্ত ছিলেন যে মুসলমানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তখনো সম্ভব হয়নি। তাদের যেটুকু বিবরণ পাওয়া যায় তার অনেকটাই তুর্কী সমাজের অনুরূপ। ধীরে ধীরে মুসলমানগণ এদেশে বসতি স্থাপন করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। হাসনহাটি কাজিহাটি, জোলাহাটা এই নামের ভিতর দিয়েই বোঝা যায় ঐ স্থানগুলি মুসলমান অধ্যুষিত ছিল। এখানকার মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠিত অভিজাত। তাদের সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়, যেমন অভিজাত সমাজে পান-সুপারির বিশেষ প্রচলন হয়েছিল, তাদের পান জোগাবার জন্য দাসী বা বাঁদী থাকত, পুরুষের খাস চাকর থাকত। বাঁদীরা পান তৈরি করত, সালন চাখত, বেশবাস করাত। বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে —

"চাঁপা বিবি করয়ে করুণা
প্রাণের অধিক মোর সাত বাঁদি ছিল ঘর
বিপাকে মরিল সর্বজনা।
... ...
জাফরি মরিয়া গেল পান জোগাইত ভাল
নিবারিতে নারি আর মনে।" (বিপ্রদাস/৭৭)

মুসলমান সমাজে বোধ হয় আফিম ও তামাক খাওয়ার প্রচলন ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে তামাক ও হুকার উল্লেখ পাওয়া যায় –

"কর্পূর তাম্বুল খায় কস্তুরি-চন্দন গায়
গোলামে জোগায় ঘনে ঘন।
... .

কেহ আনন্দিত হৈয়া সুবর্ণের হুকা লৈয়া
তমাকু ভরিয়া দেয় আগে।" (ঐ/৬৭)

পোশাক হিসাবে মুসলমান পুরুষরা ব্যবহার করত ইজার। তাছাড়া গায়ে চাদর, মাথায় টুপি, পরিধানে পাজামা ব্যবহার করত –

"মাথায় পরেছে টুপী পিন্ধল ইজার।
গায়েতে চাদর দিয়া আসা হাতে তার॥" (বংশীদাস/৬১)

তৎকালীন মুসলমান সমাজের প্রধান খাদ্য ছিল রুটি, তাছাড়া ভাতও তারা খেত। মুসলমানরা 'হেড়া' সম্ভবত মাংস ভক্ষণ করত, কেননা বিপ্রদাসের কাব্যে হিন্দুর মুখে 'হেড়া' ঘষে দেওয়ার প্রসঙ্গ আছে। তাছাড়া তারা পেঁয়াজ, রসুন ও মুরগীর মাংস খেত। ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই –

"হেড়া আর রুটি : করি পরিপাটি : ছিল পিঁয়াজের কোষা।
পূর্ণিত সানকি : রৈল খানা কি : খাইতে মিঞার আশা॥" (ক্ষেমানন্দ/১২৮)

মুসলমানরা বিছানায় বসে ভোজন করত। যেমন –

"সৈয়দ হাসন কাজি বসি বিছানাত।
লাড়কা করিয়া সনে সুখে খায় ভাত।" (বাইশা/৭০)

নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে বদনা বা গাড়ু, সানকি ইত্যাদি ব্যবহার হত। মুসলমানদের জীবিকা ছিল প্রধানত কৃষি। বিপ্রদাসের কাব্যে গোরা মিনা নামে এক মুসলমানের চাষবাসের প্রসঙ্গ আছে। তাছাড়া তারা হাঁস ও মুরগী প্রতিপালন করত, ছাগল পালন করত, মনসামঙ্গলে এসমস্ত প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। হিন্দুসমাজের মত মুসলমান সমাজে বৃত্তিধারী জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। যেমন কাজীরা বিচার করত, জোলারা তাঁত বুনত, পট আঁকত পটিদাররা, নৃত্য করত নটীদাররা, দর্জিরা কাপড় সেলাই করত, মখদমরা মাংস কাটত, হাজমরা সুন্নত করত। বিপ্রদাসের বর্ণনায় পাই –

"বুড়ো জোলা এক মনে তাঁত বোনে ঘনে ঘনে
ঘাড়া নাড়া দিয়া অতিশয়।" (বিপ্রদাস/৮০)

কিংবা, বংশীদাসের বর্ণানুযায়ী –

"হাসেন হোসেন কাজি গোষ্ঠী তারা জোলা।
পড়িয়া হয়েছে খল করে কাজিয়ালা॥
কাপড় বুনিয়া খায় এই বৃত্তি ছিল।
জীবন উপায় এই তারে ছাড়ি দিল॥" (বংশীদাস/৬০)

আবার ক্ষেমানন্দের বর্ণনায় পাই –

"নগর বাজারে : মৈল পটিদারে : পট লয়্যা মাগে যেবা।
নিজ ঘরে জোলা : মরিয়া ত গেলা : তাঁত বুনে আর কেবা॥
... ...
হাজমে হাজত : কৈল অবিরত : রহে সুন্নতের খুর।
বিঘত্যার বিষে : মরিল নিমিষে : শূন্য হৈল তার পুর॥
মৈল মখদম : নিল তারে যম : কাটিত বকরি গলা।
গাএত কম্বল: খাইত আম্বল: আফিঙ্গ আঠার তোলা॥" (ক্ষেমানন্দ/১২৭-১২৮)

মুসলমান সমাজে দৈবজ্ঞ, আউলিয়া, দরবেশদের প্রভাব ছিল এবং এদের প্রতি সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ছিল। তাই মনসা দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশ ধারণ করে হাসনের বিবিকে ছলনা করতে যায় –

"হাসন বেড়িল নাগে বিবি ছলিবার যোগে
চলিলা দৈবজ্ঞ-রূপ হৈয়া।

... ...

এই বাড়ি জানা পথে এখনি আসিব ভূতে
অগ্নি জ্বালি দিহ তার গায়।" (বিপ্রদাস/৭৬)

পাঁজি, পুথি দৈত্য-দানো, ভূত-প্রেতের প্রতি ভয় ও বিশ্বাস ছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ লম্বা দাড়ি রাখত, নিয়মিত রুজু-নামাজ- রোজা করত, কিতাব-কোরাণ পাঠ করত, বিপ্রদাসের বর্ণনানুসারে -

"কাজি মজলিস করি কেতাব কোরান ধরি
খাতাগুলা তজবিজ করে।
সোয়ার পেয়াদা কত মজুদাত শত শত
সদা পাঁচ হাতিয়ার ধরে।
কেহ বা জুলুম করে কেহ গুনা শিরে ধরে
রুজু করি করয়ে নছাব
জতেক ছৈয়দ মোল্লা জপয়ে ত বিসমল্লা
সদা মুখে কলিমা কেতাব।" (ঐ/৬৭)

ক্ষেমানন্দের কাব্যের বর্ণনায় ও মুসলমান সমাজের এই সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় —

"বেলা হৈল অবসান : কাজী মোচড়ায় কান : নমাজ করএ উঠি পড়ি।
সৈয়দ সুন্নেক যত : কোরাণে গাহেন গীত : দরবেশ বাজায় দাড়ি॥" (ক্ষেমানন্দ/১২০)

মুসলমান ফকির ও মোল্লারা মসজিদে বা ফকিরের মোকামে সন্মিলিত হয়ে থাকত, সেখানে তারা কোরাণ পাঠ করত, কলন্দর গাইত। আউলিয়া দরবেশরা পীরের মোকামে বসবাস করত, তারা ছিল সংসার ত্যাগী, ভিক্ষোপজীবী। ক্ষেমানন্দের বর্ণনায়—

"কপি লয়্যা কুলি কুলি : মারাঠা মাগিয়া বুলি : চালু কড়ি প্রতি ঘরে ঘরে।
পীরের মোকাম ঘরে : কলিমা ফয়তা পড়ে : আউল্যা দরবেশ বলি তারে॥"(ঐ/১২১)

এই শ্রেণীর মুসলমানগণ হিন্দুসমাজের কাছে শ্রদ্ধা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য অনেক কাজী, মোল্লারাই ছিল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন। দাড়ি রাখা, সুন্নত করা মুসলমানগণের কাছে পবিত্র কর্ম ও ধর্মাচার বলে গৃহীত হত। সাধারণ মানুষ পীরের দরগায় কামনা-বাসনা পূরণের জন্য মোরগ, ছাগল উৎসর্গ করত, তাছাড়া কোরবানী প্রদান তাদের কাছে পবিত্রকর্ম বলে গণ্য হত। ক্ষেমানন্দের বর্ণনানুসারে —

"টাক্যায় বুলায় হাথ রক্ষা কর আল্লা।
বারেক দেশেরে যদি নিঞা যায় তাল্লা॥
দুইটি মোরগ দিব পীরের নিয়ড়ে।" (ঐ/১১৬)

মুসলমান সমাজে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। বিপ্রদাসের কাব্যে হাসনের শত বিবির কথা পাই. আবার নারীরও বহুপতি গ্রহণের কথাও পাওয়া যায়। বোধ হয় নারীর বহুপতি গ্রহণ মুসলমানদের সামাজিক দৃষ্টিতে অন্যায় ছিল না। কবিরা কৌতুককর ঘটনা হিসাবে শ্লেষের ভঙ্গীতে ব্যক্ত করলেও তা সত্যমূলক তথ্য। ক্ষেমানন্দের বর্ণনানুসারে –

"কালিয়া কম্বল গায় মরিল শেখানী।
আঠার শেখেতে তারে কব্যাছে কামিনী॥
মর‍্যাছে আঠারজন সে নব যৌবনে।
একেক দিবস লয়্যা থাকে একজনে॥" (ঐ/১২৫)

ইসলাম ধর্মের নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহ কবরস্থ করা হত। কবরের চার কোণে কলাগাছ পুঁতে মৃতের শিয়রের দিকে জলপূর্ণ কলস রাখা হত। ক্ষেমানন্দের বর্ণনানুযায়ী —

"মাটি কুড়ি কুড়ি হাদিরা বনান।
চারিদিগে দিল চারিগাছি মান॥
হেড়া রুটি দিয়া পড়িল কোরাণ।
মাটি দিল তবে যত মুছলমান॥
... ...
চারিদিগে চারি রুপিল কলা।
হক্‌ক আল্লাহ জপে রসুল্লা॥
বুক কুড়ি কুড়ি কবর বেঢ়ি।
গাগরি পূরিয়া শিয়রে এড়ি॥" (ঐ/১২৯)

মনসামঙ্গলের হাসন-হোসেন পালায় তৎকালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। সমগ্র মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে চিত্র পাওয়া যায় মনসামঙ্গল কাব্যে, অন্যান্য কাব্যেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। অতিরঞ্জন থাকলেও তার ঐতিহাসিক সত্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। দু'টি ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাস শুরু করলেও হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পরধর্ম বিদ্বেষী ছিল। বিশেষত নবাগত মুসলমানগণ শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাপুষ্ট হয়ে হিন্দুর উপর অত্যাচার করত। বিজয় গুপ্ত থেকে বংশীদাস পর্যন্ত সকলেই কম বেশী এই চিত্র বর্ণনা করেছেন। কাজীরা তৎকালীন মুসলমান শাসকের নিযুক্ত বিচারক। কিন্তু তারা বিচারেরক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে পারত না। মনসামঙ্গলের বিবরণ অনুসারে কাজির প্ররোচনায় মোল্লারা হিন্দুর উপর অত্যাচার করে দেব-দেউল ভেঙ্গে দেয়। বিজয় গুপ্তের বর্ণানুসারে —

"একখান ঘর দেখে বন চারিভিতে।
মনের হরিষ মোল্লা গেল ছায়া লইতে॥
ঘরখানি বেড়িয়া রাখালে খেলায়ে।
জয়ে জয়ে বলিয়া সানন্দে গীত গায়ে॥
কেহ ঢাক ঢোল বাজায়ে মৃদঙ্গ ঘন ঘন।
মধ্যে মধ্যে ঘন্টা বাজায়ে বিচিত্র লিখন॥
ঠাই ঠাই দেখিলেক ছাগলের রক্ত।
কাজির প্রতাপে বেটা বড়হি দুরন্ত॥
আল্লা আল্লা বলিয়া যায়ে ঘট ভাঙ্গিবার।" (বিজয়/১২৩)

হাসন-হোসেন শাসক হয়েও পরধর্ম সহিষ্ণু ছিল না, অনুচরের মুখে হাসনহাটিতে মনসাপূজার কথা শুনেই সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে—

"এই ত হাসনহাটি হাসনের পাট।
তাহে অবতার হৈল হিঁদুয়ার ঠাট॥
যবনের পুরে আইল হিন্দুর দেবতা।

হাসন হুসন দূত-মুখে শুনে কথা॥

... ...

মার মার শব্দ ঘন ডাকে দুইভাই।

সকল নগরে হৈল মহা ধাওয়াধাই॥" (ক্ষেমানন্দ/১০৫)

বংশীদাসের কাব্যেও পাই মোল্লাগণ অকারণে রাখালগণের পূজার ঘটবারি ভেঙ্গে দেয় –

"সেই মোল্লা গেল তবে গোয়ালার বাড়ি।

মণ্ডপ ঘরেতে দেখে পূজে বিষহরি॥

তার কাছে গেল মোল্লা দেখিবার ছলে।

পূজা দেখি মোল্লা তাই বিছমোল্লা বলে॥

বিছমোল্লা বলিয়া মোল্লা ধরে দুই কান।

সৈদের মাটিতে ভাই কিসের হিন্দুয়ান॥

এতেক বলিয়া মোল্লা না করিল আন।

আসার বাড়িতে ঘট কৈল খান খান।" (বংশীদাস/৬১)

কাজী ও মোল্লার আত্মীয়রাও নিজেকে ক্ষমতাবান বলে মনে করে হিন্দুর উপর অত্যাচার করত। মদ্যপ অবস্থায় ব্রাহ্মণদের অপমান করত, তুলসী গাছ অপবিত্র করত –

"তুলসীর পত্র পায়ে যাহার মাথাতে।

চুলে ধরি আনে তারে আপনা সাক্ষাতে॥

সোগার তলে মাথা থুইয়া মারে উভাকিল।" (বিজয়/১২২)

অকারণেই তারা হিন্দুর জাতি নষ্ট করার ভয় দেখাত। সেকালে হিন্দুদের গরুর মাংস খাইয়ে, কলমা পড়িয়ে, সুন্নত করিয়ে কিংবা মুসলমানের সঙ্গে নিকা করিয়ে বলপূর্বক মুসলমান করার ভয় দেখাত। বিজয় গুপ্তের কাব্যেও এরকম প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের কাব্যে ছদ্মবেশী মনসাকে 'হেড়া' খাইয়ে মুসলমান করার কথা পাই —

"সহিতে না পারি জ্বালা বলে সভা প্রতি

বিষম বামনি বুড়ী ধর শীঘ্রগতি।

হেড়া খাওয়াইয়া দিব দেহ পাখড়িয়া

দরবেশে নিকা দিব কলিমা পড়াইয়া।

... ...

ফকিরের মুসলমাত করাইব তায়

শুনিয়া কুপিল অতি দেবী মনসায়।" (বিপ্রদাস/৭১)

বিপ্রদাসের কাব্যে পাই চাঁদ সদাগরকেও মুসলমান করার চেষ্টা ও জাতিনাশ করার কথা—

"কেহ দুষ্ট ভাত লইয়া জাচায় রাজায়

কেহ মুখে ঝুটা পানি দিতে চাহে গায়।

আর দরবেশ মাতোয়ালা হইয়া জায়

চামড়ার বাড়ি মারে চাঁদোর মাথায়।

আর দরবেশ তৈকা মাথে দেয় তুলি

উসারিয়া জায় রাজা শিব শিব বলি।" (ঐ/১৬৩)

ক্ষেমানন্দের কাব্যেও অনুরূপ প্রসঙ্গ পাই –

"মারিয়া চামের দড়া : গিলাবে গরুর হেড়া : খুব দিয়া করিবে যবন।"(ক্ষেমানন্দ/১০৭)

হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করার কথা ঐতিহাসিক সত্য। মনসামঙ্গলে সদ্য ধর্মান্তরিতকরণের প্রমাণ পাওয়া যায়-

"হিন্দুত কলিমা দিল মুছলমানি শিখাইল
তথা বৈসে জত মুছলমান
শিখাএ নামাজ অজু সদাই মক্তবে রুজু
নিরন্তর খলিপা জোগান।
নিকা-বিভা ঘনে ঘন তথা করে সর্বজন
সদা খোসালিত অতিশয়
মোকাদিমে লৈয়া জায় কালিমা কোরান তার
ফএতা পড়িয়া সাঙ্গ হয়।" (বিপ্রদাস/৬৭)

অনুরূপ কথা পাই আশুতোষ ভট্টাচার্য সম্পাদিত বাইশাতে –

"পূজা ভাঙ্গি ঘটবারি ভাঙ্গিয়া ফেলায়।
যতেক মঙ্গল দ্রব্য পাড়ে দুই পায়॥
ব্রাহ্মণের জাতিনাশ করিবার ছলে।
কর্ণেও কলিমা পড়ে যবন সকলে॥" (বাইশা/৭১)

শুধু তাই নয়, তারা অবাধ্য হিন্দুর গৃহদাহ পর্যন্ত করত। যেমন—

"ভাই বলে, 'হিন্দু মারিয়া কার্য নাই।
আগুন লাগায়্যা ঘর পুড়ি কর ছাই'॥" (বাইশা/৬৯)

হিন্দুর দেবদেবীকে মুসলমানরা ভুতপ্রেতের সঙ্গে তুলনা করেছিল। মুসলমান ঘরের মেয়েরাও হিন্দু বিদ্বেষী ছিল —

"দেখিয়া পদ্মার মায়া বলে রুষ্ট বাণী
বোজা মাসে ভূত কেন পূজিস ডাইনি।" (বিপ্রদাস/৬৬)

মুসলমানের দৃষ্টিতে হিন্দুরা ছিল বিধর্মী কাফের। মুসলমানের এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে হিন্দুরা শুধু প্রতিবাদ গড়ে তুলেছিল তাই নয়, হিন্দুর কাছে মুসলমানরা ছিল যবন, অস্পৃশ্য; তাদের সহ্য করাও হিন্দুদের কাছে সম্ভব ছিল না। তাই হিন্দুর অধিকৃত এলাকায় মুসলমানদের অকারণেই নিগ্রহ করা হত। বিপ্রদাসের কাব্যে দেখি নির্দোষ গোরামিনার গোলাম রাখালগাছিতে এলে গোয়ালাগণ অকারণেই তাকে প্রহার করতে উদ্যত হয়। বিপ্রদাসের বর্ণনায় –

"জেখানে রাখালগণ পূজে মনসায়
দৈবযোগে সে গোলাম তথাকারে জায়।
ক্রোধযুক্ত হৈল সবে তুড়ুক দেখিয়া
ধর ধর ডাক ছাড়ি গেল খেদাড়িয়া।
একেলা গোলাম সবে রাখাল বিস্তর
পালাইয়া গেল গোরা মিনার গোচর।
সভয় কম্পিত অতি সব কথা কয়
বিনি দোষে রাখাল মারিতে মোরে ধায়।" (বিপ্রদাস/৬৩)

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি সম্পন্ন ছিল; বস্তুত মুসলমানগণের বিধর্মীর প্রতি অত্যাচার দেখে হিন্দুরাও মারমুখী হয়ে উঠেছিল। ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখি হাসনের দূতগণ রাখালগণের মনসাপূজার দ্রব্য লুণ্ঠন করলে রাখালগণ মারমুখী হয়ে ওঠে। বংশীদাসের কাব্যেও দেখি রাখালগণ প্রতিরোধ হিসাবে মুসলমানদের লাঞ্ছিত করে –

"তাহা দেখি গোয়ালা সব ধায় তরবড়ি।
বেড়িয়া ধরিল সবে তার লম্বা দাড়ি॥
দাড়িতে ধরিয়া কিল মারে শতে শতে।

চড় লাথি গলাধাক্কা না পারি কহিতে॥
নয়া ধাড়ীতে নিয়া দিল মার্গ ছেচারণ।
মিনতি করিয়া বলে ধরিয়া চরণ॥" (বংশীদাস/৬১)

মনসা হিন্দুশাসকের প্রতিভূ, হিন্দু নেতৃত্বের প্রতিভূ। মনসার সর্পসৈন্যদের দ্বারা মুসলমানরা পরাভূত হয়ে শেষ পর্যন্ত হিন্দুর কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়, হিন্দুর দেবদেবীর স্তব-স্তুতি করে। হাসন- হোসেনও মনসাপূজা করলে দেবী হিন্দুর রাজ্যে মুসলমানের বসতি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করে-

"যাহা ইচ্ছা থাকে বর মাগ নরপতি
ছত্রিশ আশ্রম লৈয়া করহ বসতি।
শুনিয়া হাসন রাজা দ্রবিদ-হৃদয়
ক্ষিতি লুটি অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি কয়।
অপরাধ ক্ষেম মোরে জগত-জননী
পাপ মুখে কতেক বলিল মন্দ বাণী।
জগত-ঈশ্বরী তুমি আদি নিরাঞ্জন
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।" (বিপ্রদাস/৮১)

বংশীদাসের কাব্যেও দেখি হাসনের জননী নবলক্ষের পূজা দিয়ে স্তবস্তুতি করেছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মানুষকে আপন ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ও অন্য ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করায়। নবাগত মুসলিমরা হিন্দুসমাজে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রচার চালাতে থাকে। ক্ষেমানন্দের কাব্যে বলা হয়েছে-

"বাসুরে, হিন্দুভূত কেন পূজ্যা মর।
লক্ষ লক্ষ পীর কাছে : লক্ষেক পীরানী আছে : তার সেবা কেন নাই কর॥
কোরাণে কাজীর পাশ : শুন তার ইতিহাস : খোদায় জপন বড় ধন।"(ক্ষেমানন্দ/১০৭)

এভাবে ধর্মান্তরিত সম্ভব না হলে দৈহিক নির্যাতন ও বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত। কিন্তু শুধু মাত্র ভয় দেখিয়ে হিন্দুর ধর্মান্তরিতকরণ খুব একটা হয়নি। হিন্দুরাও আপন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে সচেষ্ট হয়েছিল। হাসন-হোসেন ও মনসার দ্বন্দ্বে হাসনের পরাজয় ও মনসার জয় হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলে মনে করা যায়। নারায়ণ দেব কাব্যে হাসন-হোসেন পালা বর্ণনা না করলেও হাসন-হোসেনকে চোর, ডাকাত বলে উল্লেখ করেছেন; আসলে মুসলমানগণ ধর্মবিদ্বেষ বশত অনেক সময় হিন্দুর ধনসম্পদ লুন্ঠন করত। তাই নারায়ণ দেবের কাব্যে চাঁদ সদাগর মুসলমানদের শুধু মাত্র চোর-ডাকাতই বলেননি প্রথমে দেবীর শত্রু ও পরে পূজক রূপে চিহ্নিত করেছেন। কবির এই মনোভাব ধরা পড়েছে কালনাগিনীর প্রতি দেবী মনসার উক্তিতে —

"হাসন হুসেন দুই ভাই আমি গেলাম তার ঠাই
দিল্লিপের হয়ে রাজা।
আমার রাখাল মারি ভাঙ্গিছিল ঘট বাড়ি
ভয়ে দিল নবলক্ষের পূজা॥" (নারায়ণ/৬৮)

এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান শক্তি অনেকক্ষেত্রেই হিন্দুশক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে এবং ভীত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে। বস্তুত হাসন-হোসেন পালা হিন্দু নরপতি ও মুসলমান নবাবের দ্বন্দ্ব। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু শক্তিকে পরাভূত করে মুসলমান শক্তি বিজয়ী হলেও সামাজিক ও সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে হিন্দু শক্তির কাছে পরাভূত হয়। ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতি আত্মীকৃত হয়ে যায়।

মনসামঙ্গলে বর্ণিত এই সমস্ত চিত্রাবলী থেকে একথা স্পষ্ট হয়— বিশেষত, চৈতন্য-পূর্ব যুগে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক একেবারেই সুস্থ ছিল না। মুসলমানের অত্যাচার হিন্দুসমাজকে আক্রান্ত করেছে, মুসলমানরাও অনেকক্ষেত্রে হিন্দুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে এই সমস্ত বর্ণনা অনেকটা গতানুগতিক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিজয় গুপ্ত মুসলমানদের অত্যাচারের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন— পরবর্তীকালের কবিরা, বিশেষত

চৈতন্য-পরবর্তীকালের কবিরা অনেকটা তাঁকে অনুসরণ করেছেন। তবে একথাও বলা যায় যে, চৈতন্য-পরবর্তীকালের কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের যে চিত্র পাওয়া যায় তা একেবারে অলীক নয়, কেননা মুকুন্দ চক্রবর্তী যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তা সর্বৈব চিত্র নয়। বিভিন্ন সময়েই হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছিল। মধ্যযুগের কবিগণ মোটামুটি কয়েকটি উদ্দেশ্য প্রতিপূরণের জন্য এই চিত্র তুলে ধরেছেন। সেগুলি সূত্রাকারে উল্লেখ করা যেতে পারে-

প্রথমত : নবাগত মুসলমান শ্রেণী তথা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে শাসিত শ্রেণীর জনমানসকে প্রতিরোধ চেতনায় উদ্দীপিত করে তোলা।

দ্বিতীয়ত : ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের ভাঙন রোধে হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা এবং অন্য ধর্মকে হীন প্রতিপন্ন করা।

তৃতীয়ত : দেবীর মুখ নিসৃত বাণীতে জনমানসে আস্থা অর্জন ও ক্ষয়িষ্ণু সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করা।

চতুর্থত : মুসলমানকে হিন্দুর শত্রু রূপে চিহ্নিত করে রক্ষণশীল সমাজের সীমারেখা বজায় রাখা।

প্রকৃতপক্ষে মনসামঙ্গলে হাসন-হোসেনকে অশুভ শক্তির প্রতীক রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে অসুররা যে অর্থে অশুভ শক্তির প্রতীক, মনসামঙ্গলে 'যবন'রা সে অর্থেই স্থান গ্রহণ করেছে। জনমানসে পৌরাণিক কাহিনীসমূহ বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই অনুকৃতি মঙ্গলকাব্যগুলি।

তথ্যপঞ্জী

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৫৫-১৬০।

২। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ২৭২।

৩। ঐ, পৃঃ ২৪৯-২৫৮।

৪। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৯১।

৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩১৫।

৬। ঐ, পৃঃ ৩৩৩-৩৩৪।

৭। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৯৭।

৮। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, প্রথম খণ্ড, দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, পৃঃ ১৯৭।

৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩২৩।

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৯।

১১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৭৯।

১২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১৯।

১৩। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৫১।

১৪। ঐ, পৃঃ ৪০২।

১৫। ঐ, পৃঃ ৪০৭।

১৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ১৬১।

১৭। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৪৫।

১৮। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১১২।

১৯। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৬১।

২০। ঐ, পৃঃ ৪১১।

২১। ঐ, পৃঃ ৩৭০।

২২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড, ডঃ সুকুমার সেন, পৃঃ ২৪৩।

২৩। ঐ, পৃঃ ২৪২।

২৪। ঐ।

২৫। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩৬৪।

২৬। 'পদ্মাপুরাণ', সুকবি নারায়ণ দেব ও পণ্ডিত জানকীনাথ, উদ্ধৃতিটি 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ', মুহম্মদ আবদুল জলিল থেকে গৃহীত, পৃঃ ১০৩।

২৭। ঐ, পৃঃ ১০৩।

২৮। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ, মুহম্মদ আবদুল জলিল। পৃঃ১৮৯।

২৯। ঐ।